ঈশ্বরের

স্বরূপতত্ত্ব ও প্রার্থনা।

সাধুমহাত্মাদিগের মুখারবিন্দ নিঃসৃত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ
উপাসনামূলক সার্ব্বভৌমিক
তত্ত্বোপদেশ।

সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পাঠ্য
ধর্ম্মগ্রন্থ।

জেলা খুলনা, পোঃ আঃ ছয়ঘরিয়ার অন্তর্গত
আম্রতলা গ্রাম নিবাসী
শ্রীরামচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৬নং কলেজ-স্কোয়ার, সাম্য-প্রেসে
শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩৩২ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা

বিজ্ঞাপন।

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে সেই অনন্ত মহিমাময়ের স্বরূপতত্ত্ব সংগ্রহপূর্ব্বক জনসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করা বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশার ন্যায় নিতান্ত দুরাশামূলক হইলেও উহাতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম না। কারণ, সেই পরমারাধ্য পরম পিতার পূজায় ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উচ্চ, নীচ সকলেরই সমান অধিকার আছে। এই জন্য আমি, ব্যক্তি, জাতি ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে, সকল ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতাভগ্নীগণকে ইহা পাঠ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। ইহার সাহায্যে যদি কোন মানবাত্মা ঈশ্বরানুগত্য লাভে সমর্থ হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল বোধ করিব। ইতি

শ্রীরামচন্দ্র দত্ত।

ভূমিকা।

বাঙ্গালা দেশে বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা-লাভ করিবার কোন সুযোগ দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্ব স্ব জাতীয় ভাবমূলক যে সমুদয় উন্নত ধর্ম্মসাহিত্য আছে, তাহা সাধারণের অবোধ্য এক একটী বিশেষ বিশেষ ভাষায় রচিত। যথা হিন্দু-দিগের বেদ বেদান্ত সংস্কৃত ভাষায়, মুসলমানদিগের কোরাণ আরবী ভাষায় এবং খ্রীষ্টানদিগের বাইবেল ইংরেজী ভাষায় রচিত। ঐ সমুদয় ভাষায় বিশেষরূপ অধিকার লাভ করিতে না পারিলে বাঙ্গালীর ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঐ সমুদয় ভাষায় বিশেষরূপ অধিকার লাভ করা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। এইজন্য যাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণ, তাঁহাদিগের স্ব স্ব সম্প্রদায়গত ধর্ম্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব জ্ঞানলাভে সমর্থ হন, সেই অভিপ্রায়ে এই পুস্তক রচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। বর্ত্তমান কালের সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের সমুদয় ধর্ম্মের সারতত্ত্ব প্রেমভক্তি লাভ। কিন্তু যেখানে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব, সেখানে প্রকৃত ভক্তিলাভ অসম্ভব। ভক্তির পাত্রকে নিজে না জানিয়া চিনিয়া কেবল পরের দৃষ্টান্তে বা পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া যে ভক্তি করা যায়, তাহা উপকারী হইলেও তাহাকে অন্ধভক্তি বলা যায়। ফলতঃ, জ্ঞান ও ভক্তি মূলে একই বস্তু; প্রকাশে ভিন্নত্ব দেখায়। জ্ঞানহীন ভক্তি প্রকৃত ভক্তি নহে এবং ভক্তিহীন জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে। তাহা শুষ্ক

নীতিবাদ মাত্র। সুতরাং প্রকৃত ভক্তি লাভ করিতে হইলে ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্বে জ্ঞানলাভ করা বিশেষ আবশ্যক; নতুবা আর কোন পন্থা নাই। যিনি যতই সাধন ভজন ও কঠোর তপস্যা করুন, তাঁহাকে জ্ঞানের পথে উঠিতেই হইবে। এই জন্যই আমাদিগের সেই ভক্তির আধাররূপী পরম প্রেমময় পরমেশ্বর কি প্রকার, অর্থাৎ তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহাই অবগত হওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এই স্বরূপতত্ত্ব যদিও সংস্কৃত, আরবী, পারসী, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষাগত উন্নত ধর্ম্মসাহিত্যে বিবিধ প্রকারে বর্ণিত হইয়া তাহার বঙ্গানুবাদরূপে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু তাহা কুত্রাপি একাধারে সম্যক ও সুবোধ্যরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্যই যাঁহাদের ধর্ম্মপিপাসা প্রবল হইয়া উঠে, তাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী বিধিবদ্ধ নিয়ম-সমূহ অবোধ্যভাবে গ্রহণপূর্ব্বক অন্ধবিশ্বাসের বশীভূত হইয়া পালন করতঃ স্বাধীন উন্নতিশীল মানব জীবনের ধর্ম্মপিপাসা নিবৃত্তি করিয়া থাকেন এবং অল্পশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীস্থ ধর্ম্ম-পিপাসুগণ সাধু-সন্ন্যাসী ও ফকিরাদির শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মসাহিত্য আরও জটিল ও দুর্ব্বোধ্য। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় সহজবোধ্য ধর্ম্মগ্রন্থাভাবে দেশের সম্মিলিত জাতীয় শক্তির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে। এই অভাব দূরীকরণার্থে আমি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সেবকরূপে তাঁহাদের ধর্ম্মজ্ঞান লাভের জন্য এই পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি কি না, তাহা সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞই জানেন। তাঁহার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক।

সূচীপত্র।

একমেবাদ্বিতীয়ং—সত্যমেব জয়তে

ঈশ্বরের

স্বরূপতত্ত্ব ও প্রার্থনা।

—:*:—

উপক্রমণিকা।

বর্ত্তমান সভ্যজগতের মানবকুলে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস, সকল সম্প্রদায় ও সকল জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সেই সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের উপাসনা প্রণালী, বিশেষ বিশেষ ভাবাপন্ন হইলেও মূলে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় বিশ্বাস সাধারণতঃ প্রায় এক প্রকার। এইজন্য বর্ত্তমান সময়কে একেশ্বরবাদের যুগ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস এক প্রকার হইলেও তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে বিশ্বাস ও ধারণা জনসাধারণের এক প্রকার নহে। উহা সম্প্রদায় বিশেষে অতিশয় ভিন্ন ভিন্ন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন কোন স্থলে কিয়ৎ পরিমাণে সাদৃশ্য থাকিলেও অধিকাংশ স্থলে বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ঐ ঐ সম্প্রদায়গুলি হইতে উৎপন্ন ও

উহাদিগের অন্তর্গত শাখা সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও পরস্পর বিরোধ লক্ষিত হয়। এই যে স্বরূপতত্ত্বের বিরোধ বা পার্থক্য, ইহার কারণই হইতেছে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা। ঈশ্বর যদি সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে এক হন, তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হওয়া স্ববিরোধী ও অসঙ্গত। অতএব যাহা সর্ব্ববাদীসম্মত ও যুক্তিতর্ক দ্বারা মীমাংসিত, তাহাকেই প্রকৃত স্বরূপ বলা যায়। আর যাহা যুক্তির অতীত, ব্যক্তি বা সমাজগত অন্ধবিশ্বাসের অন্তর্গত, তাহাকে প্রকৃত স্বরূপ বলা যায় না। তাহা সম্প্রদায়গত সংস্কার বিশেষ মাত্র। সুতরাং ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ যাহা, যাহা মানবের জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্ত্তৃক যুক্তিতর্ক দ্বারা সত্যরূপে মীমাংসিত হইয়াছে, সেই সত্যস্বরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ দেখা যাউক, মনুষ্যের ঈশ্বরোপাসনার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য তাঁহাকে লাভ করা, তাঁহাকে অন্তঃকরণে ও বাহ্যজগতে চিরজাগ্রতরূপে অনুভব করা, তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে চিত্তে ধারণা করা, তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তন্ময়ত্ব লাভ অর্থাৎ একেবারে তাঁহার হইয়া যাওয়া; তাঁহাকে একমাত্র জীবনের আদর্শরূপে স্থাপন করিয়া সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদনরূপ তাঁহার আদেশ পালন করা, তাঁহার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রীতি স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করা, ইত্যাদি। এই সমুদয় উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য যে সমুদয় সঙ্কীর্ণতামূলক, ব্যক্তিগত সুখ-স্বচ্ছন্দতা সাধনের উদ্দেশ্য, তাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে; কল্পিত খেয়াল মাত্র। সুতরাং তাঁহাকে লাভ করিয়া তাঁহার হইয়া যাওয়াই, ঈশ্বরোপাসনার সর্ব্ব-

বাদীসম্মত সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। এক্ষণে দেখিতে হইবে, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান আবশ্যক কি? সাংসারিক কোন বস্তু লাভ করিতে হইলে, প্রথমে সেই বস্তুটী চিনিয়া লইবার আবশ্যক হয়। অর্থাৎ সেই বস্তুটীর আকার প্রকার, গুণাবলী ও গঠন-প্রণালী জানিয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে নির্দ্দেশসূচক স্বরূপ দ্বারা চিনিয়া লইতে হইবে। নতুবা কেবল তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলে বা চেষ্টা করিলে, কিছুতেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। এবং পাওয়া গেলেও তাঁহাকে সেই বস্তু বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইবে না।. ঈশ্বর সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা। তাঁহার নির্দ্দেশসূচক স্বরূপতত্ত্ব অবগত না হইলে, তাঁহাকে কিছুতেই পাওয়া যাইবে না। ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, একথা বোধ হয় বর্ত্তমান সভ্যজগতের বালকেরাও জানে। কিন্তু কয়জন লোক বলিতে পারে যে, আমরা অবিচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাহা বলিতে পারে না বা বুঝিতে পারে না তাহার কারণ এই যে, সাধারণে উপরিউক্ত বিশেষণগুলি পুস্তকে পড়িয়া বা লোকমুখে শুনিয়া রাখিয়াছে মাত্র। আপনার বুদ্ধিযোগে ঐ সমুদয় বিশেষণের লক্ষণে কখনও তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া দেখে নাই। যেমন দুগ্ধে ঘৃত আছে, একথা সকলেই জানে। অথচ কেবল দুগ্ধের বাহ্য রূপগুণ দেখিয়া তাহাতে কোন প্রকারে ঘৃতের লক্ষণ পাওয়া যায় না। সেই দুগ্ধ কোন দণ্ড দ্বারা মন্থন করিলে তবে ঘৃত পাওয়া যায়; সেইরূপ এই দৃশ্যমান জগতে তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে সর্ব্বব্যাপীরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও আমরা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে তাঁহাকে ধরিয়া লইতে পারি না।

কারণ, এই বহুত্বপূর্ণ বিচিত্র জগৎ আমাদিগকে নিয়তই ভ্রমে পতিত করিতেছে। বিচার ব্যতীত এই ভ্রম নিবারণ করিবার কোন উপায় নাই। অতএব বিবেকরূপ মন্থন দণ্ড দ্বারা, সংসার দুগ্ধকে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক, বিচাররূপ মন্থন করিলে ঈশ্বররূপ ঘৃত পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহাকে পাইবার প্রধান অবলম্বন হইতেছে বিবেক। বিবেক অর্থ বুদ্ধিগত বিচারলব্ধ সত্য জ্ঞান। ইহা উপার্জ্জিত বস্তু; ইহা সহজ বা স্বাভাবিক মানব জ্ঞান নহে। যেমন আত্মানাত্মা বিবেক অর্থাৎ কোন্‌টী আত্মারূপী সত্য বস্তু; কোন্‌টী অনাত্মারূপী মিথ্যা বস্তু; সদসৎ বিচার দ্বারা এই যে অভিজ্ঞতা লাভ, ইহাকেই বিবেক বলা যায়। এই বিবেকই ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্বজ্ঞান লাভের অবশ্যম্ভাবী ফল। অনন্ত বিশ্বরূপের স্বরূপতত্ত্ব জ্ঞানলাভে যিনি যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি তত বিবেকবান্। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে, ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে অর্থাৎ তাঁহাকে পাইতে হইলে, বিবেকরূপ স্বরূপতত্ত্ব জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। কিন্তু ইহা শ্রমসাধ্য ব্যাপার; আবার ইহা ভিন্ন তাঁহাকে লাভ করিবার আর কোন পথও নাই। তিনি অপ্রমেয়, অর্থাৎ জগদীয় কোন বস্তুর তুলনা দ্বারা তাঁহার প্রমাণ করা যায় না; সুতরাং তাঁহার অপার মহিমা ও প্রকৃত স্বরূপতত্ত্ব, পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা কোন মানবেরই সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে না। এই জন্যই বেদ, বেদান্ত, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে তিনি নানা প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। কখন তাহাতে বলিতেছেন, তিনি ইহা নহে, ইহা নহে, ইহা নহে; আবার কখন বলিতেছেন, তিনি ইহা, ইহা, ইহা। এক স্থানে শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, তিনি "অবাংমানসাগোচরম্"

অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে বলা যায় না, মনের দ্বারা তাঁহাকে চিন্তা করা যায় না। অর্থাৎ তিনি বাক্য মনের অতীত। শাস্ত্র আবার বলিতেছেন, "সাধক বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে সেই নিরয়বয়ব পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। আবার সাধু ফকিরেরা বলেন, "ঈঙ্গিতে বুঝিবেক যেই জন ধীর"। ইহার ভাবার্থ হইতেছে; ধীর অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি সেই অপ্রমেয় অনন্তকে ঈঙ্গিত অর্থাৎ বুদ্ধির নিপুণতা সহকারে বুঝিয়া লইবেন। সুতরাং এই সমুদয় শাস্ত্র ও সাধু মহাত্মাদিগের সাক্ষ্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, মানব বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমাত্মাকে দর্শন ও লাভ করিতে পারে। এই সমুদয় শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি ত্যাগ করিয়া মানবজ্ঞানের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মানব সর্ব্ব বিষয়ে সসীম ভাবাপন্ন হইলেও, তাহার যে জ্ঞান, তাহা অসীম ভাবযুক্ত। সে যে কোন দৃষ্ট, অদৃষ্ট, জ্ঞাত, অজ্ঞাত বিষয়ের চিন্তা করে, সমুদয়ই তাহার জ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া চিন্তা করে। তাহার চিন্তিত কোন বিষয়ই তাহার জ্ঞানকে অতিক্রম করিতে পারে না। সে যতই দূরস্থ বা কল্পিত বিষয় চিন্তা করুক, তাহার জ্ঞান সেই চিন্তিত বিষয়ের বাহিরে অনন্তরূপে অবস্থান করে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, মানব-জ্ঞান সেই অনন্ত জ্ঞানেরই অণুপ্রকাশ। সেই অনন্তের বীজ মানবজ্ঞানে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে। ইহা তাঁহার মানবের পক্ষে অপার করুণার ফলস্বরূপ পরম দান। মানব তাঁহার সেই অণুপ্রকাশরূপী জ্ঞানবলে অনন্তের স্বরূপ যতদূর যাহা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন; তাহারই কিয়দংশের সাক্ষ্যস্বরূপ, এই স্বরূপতত্ত্ব ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছি। এই তত্ত্ব কোন সম্প্রদায়

বা ধর্ম্মবিশেষের আপত্তিজনক হইবে না। এই স্বরূপতত্ত্ব ঈশ্বর দর্শনের চশমা স্বরূপ। বয়স্ক ব্যক্তি যেমন চশমা ব্যতীত সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করিতে পারেন না, তদ্রূপ অমার্জ্জিত বুদ্ধিসম্পন্ন, ভ্রম কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তি স্বরূপতত্ত্ব জ্ঞানাভাবে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে বা চিনিতে পারে না। শতবর্ষব্যাপী একান্তমনে বসিয়া মুখে চিনি চিনি জপ করিলে যেমন মুখ মিষ্ট হয় না, বা চিনির বিষয় কিছুই জানিতে পারা যায় না, আবার ঐ চিনিকে চক্ষে দেখিয়া আস্বাদন করিলে যেমন তাহার প্রতি কোন সন্দেহ থাকে না, সেইরূপ এই স্বরূপতত্ত্বরূপ দ্বার দিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, প্রার্থনারূপ রসনেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে আস্বাদন করিতে পারিলে, আর তাঁহার প্রতি কোন সন্দেহ থাকে না।

অতএব পাঠক! আপনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন, আপনার ধর্ম্মে তাঁহার যে নামই প্রচলিত থাকুক এবং আপনার উপাসনা প্রণালী যেরূপই হউক, এই স্বরূপতত্ত্ব সাধনে তাহার কোন হানি হইবে না; ইহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। অতএব তাঁহার স্বরূপ রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে একমাত্র জীবনের আদর্শ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা সকল মানবেরই কর্ত্তব্য ও সাধনীয়। সুতরাং তাঁহাকে চিনিয়া লইবার উপায় হইতেছে তাঁহার স্বরূপতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ এবং তাঁহাকে লাভ করিবার, অর্থাৎ তাঁহাকে পাইবার ও তাঁহাকে পাইয়া, তাঁহার হইয়া যাইবার উপায় হইতেছে, তাঁহার নিকট অনুতপ্ত হৃদয়ে ব্যাকুল প্রার্থনা। যেমন সমুদ্রের লক্ষণাবলী অবগত হইয়া সমুদ্রের স্বরূপ জানা হইল, অর্থাৎ

সমুদ্রকে চিনিতে পারা গেল। কিন্তু চিনিতে পারা গেল বলিয়া তাহাতে অবগাহন করা হইল না; উহাতে অবগাহন করিবার আবশ্যক হইলে শ্রম স্বীকার করিয়া তাহাতে নামিতে হইবে; সেইরূপ ঈশ্বর লাভের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনারূপ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক যাইতে হইবে। প্রার্থনা মানে চাওয়া। ইহা অভাবমূলক। যাহার যাহা অভাব, সে তাই প্রার্থনা করে। যাহার অভাব নাই, তাহার প্রার্থনাও নাই। আবার অভাব হইতেছে, আদর্শমূলক। যাহার ব্যক্তিত্বের আদর্শ যেরূপ, তাহার অভাব বোধও সেইরূপ। কথাটা তুলনা দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন, ঘৃত মনুষ্যের দেহ রক্ষার পক্ষে একটী উপকারী বস্তু। উহার গুণ,—আয়ু, সত্ত্ব, বলজনক। এজন্য শাস্ত্রের ব্যবস্থা "ঋণ কৃত্বাঃ ঘৃতং পিবেৎ" অর্থাৎ ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ঘৃত খাদ্য পানীয়ের মধ্যে শরীর রক্ষণোপযোগী একটী উন্নত আদর্শমূলক পদার্থ। এই জ্ঞান যাহার জন্মিয়াছে, সে ঘৃতের অভাবে ব্যস্ত হইয়া তাহা সংগ্রহ করিতে যত্নবান হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ঘৃতের গুণ আদৌ জানে না, পলাণ্ডু নামক খাদ্য যাহার ঘৃতের স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ঘৃতের অভাব জন্য ব্যস্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে; যাহার আদর্শ যত ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ, তাহার অভাব বোধও তত অল্প। এই মানুষ—কেহ সুখ বিলাসের ক্রোড়ে শায়িত ও তুচ্ছ আমোদে মত্ত হইয়া পরমোপকারী পিতা-মাতার দুঃখ যন্ত্রণা নিবারণের সময় পাইতেছে না; আবার কেহ বা সম্পূর্ণ নিস্বার্থে পরের উপকারের জন্য অকাতরে স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে।

ইহার কারণই হইতেছে আদর্শের ভিন্নতা। যাঁহার আদর্শ অনন্ত, তাঁহার অভাবও অনন্ত। যাঁহার অভাব অনন্ত, প্রার্থনা তাঁহার চিরসঙ্গী। তিনি সর্ব্বদাই অভাব পূরণের জন্য প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই প্রার্থনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোন কোন স্থলে বিরুদ্ধ মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সকলই তিনি জানিতেছেন, সকল শক্তিই তাঁহার আয়ত্তাধীন। সুতরাং তাঁহার রাজ্যে যেখানে যাহা দরকার, আবশ্যক মত তাহা দিয়া রাখিয়াছেন, পুনরায় চাহিলে তিনি আর দিবেন না। সুতরাং ঈশ্বরের নিকট কোন অভাবজনিত প্রার্থনা করা বৃথা ; এই মতের বশবর্ত্তী হইয়া বোধ হয় দুঃখ নিবৃত্তির জন্য বাসনা কামনা ত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ ও অদৃষ্টবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। মানুষের অদৃষ্টে যাহা লেখা আছে, অর্থাৎ তিনি যাহা নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহা আর তিনি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহার নিকট প্রার্থনা বিফল পরিশ্রম। যাহা হউক, এ মীমাংসায় মানব-জ্ঞান তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। কারণ, কি জ্ঞানজগতে, কি কর্ম্মজগতে, কি দেহীর দেহ রক্ষার্থে, প্রতিনিয়তই আমরা বহু বিষয়ে অভাবগ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা ও তদনুযায়ী চেষ্টা দ্বারা সর্ব্বদাই সেই সমুদয় অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইতেছি। প্রার্থনা আমরা সাধারণতঃ দুই প্রকারে সাধন করি। বাহ্যজগতে প্রার্থনা করা হয় বাক্যদ্বারা ও কর্ম্মদ্বারা এবং অন্তর্জগতে প্রার্থনা করা হয়, ধ্যানযোগে অর্থাৎ চিন্তা দ্বারা। আপনার সঙ্গত প্রকার অভাবজনিত যে প্রার্থনা, বাহ্যজগতে বাক্য ও কার্য্য দ্বারা করা যায়, তাহা কর্ম্মমূলক প্রার্থনা। আর ঐ প্রকার সঙ্গত ভাবের

অভাবজনিত যে প্রার্থনা, ধ্যানযোগে ঈশ্বরের নিকট করা যায়, তাহাকে জ্ঞানমূলক প্রার্থনা বলে। কিন্তু প্রার্থনার এই দুই ভাব পরস্পর আপেক্ষিক। ইহার একটী ছাড়িয়া আর একটী নিষ্ফল। কেহ আপত্তি করিতে পারেন, জ্ঞানবিজ্ঞান বলে কর্ম্মযোগ সাধন দ্বারা যখন সকল অভাব পূরণ করা যায়, তখন ঈশ্বরের নিকট আবার ধ্যানযোগে প্রার্থনার আবশ্যক কি? কিন্তু চিত্তশুদ্ধির জন্য, অন্তঃকরণের পবিত্রতা রক্ষার জন্য, প্রবৃত্তি ও আসক্তিকে স্ববশে রাখিবার জন্য ধ্যানযোগে অন্তরের অন্তর্যামীর নিকট প্রার্থনা করা অতিশয় আবশ্যক। যিনি অন্তর্জগতে বিমল জ্ঞানরূপে, তিনিই বহির্জগতে কর্ম্মরূপে, কর্ম্মের উপাদানরূপে অধিষ্ঠিত। সুতরাং তাঁহাকে অন্তঃকরণ হইতে ছাড়িয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা অকর্ম্ম। এই জন্য জ্ঞান ও কর্ম্মযোগে অন্তরে ও বাহিরে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবার আবশ্যক দেখা যাইতেছে। অস্ফুটবাক্ শিশু ক্রন্দন করিয়া উঠিলে তৎক্ষণাৎ মাতা আসিয়া তাহাকে স্তন্য দানে সান্ত্বনা করেন। এস্থলে শিশুর ক্রন্দন হইতেছে, তাহার শারীরিক অভাবমূলক খাদ্য বস্তুর প্রার্থনা। সে যদি ক্রন্দনরূপ প্রার্থনা না করিত, তাহা হইলে মাতা তাহার নিকট আসিতেন না; কারণ মাতা জানেন যে, শিশুর ক্রন্দন করিবার শক্তি আছে; তাহার ক্ষুধা হইলে নিশ্চয়ই ক্রন্দন করিবে। সেইরূপ বিশ্বমাতা যিনি তিনি আমাদিগের জন্য বহুবিধ সামগ্রী সম্ভার দ্বারা তাঁহার এই বিশ্ব পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং আমাদিগকে প্রার্থনা করিবার শক্তি ও তদনুযায়ী দ্রব্য সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন; আমরা কোন বিষয়ে অভাবগ্রস্ত হইলে, প্রার্থনা ও

চেষ্টা দ্বারা তাহা পূরণ করিতে পারি। বিনা প্রার্থনায় বিনা চেষ্টায় কেহ কখন কোন অভীষ্ট লাভে সমর্থ হয় নাই। ইহাতে অনেকে আপত্তি করিতে পারেন এই যে, আজন্ম ঈশ্বরের নিকট কত প্রার্থনা করিলাম—কৈ, কখনতো কিছু পাইলাম না। এ কথাটা অসঙ্গত ভাবাপন্ন হইলেও একেবারে অস্বাভাবিক নহে। কারণ, আমরাও তাঁহার নিকট কত প্রকার প্রার্থনা করিয়া তাঁহার দ্বার হইতে শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি বিশ্বাসহীন হইয়া পড়ি। কিন্তু একটু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই প্রকার বিফলতার যথেষ্ট কারণ থাকে। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, প্রার্থিত বস্তু সম্বন্ধে প্রার্থী বাস্তবিক অভাবগ্রস্ত কি না? দ্বিতীয়তঃ, প্রার্থী প্রার্থনীয় বস্তু পাইবার উপযুক্ত কি না। যদি প্রার্থী বাস্তবিক অভাব-গ্রস্ত ও পাইবার উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাহা পূর্ণ করিয়া দিবেন। কিন্তু প্রার্থীকে তাহা শ্রম বিনিময় দ্বারা চেষ্টা করিয়া লইতে হইবে। উহা আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে না। মনে কর কোন ব্যক্তির দরিদ্রতা নিবারণ জন্য কিছু অর্থের আবশ্যক। এ অভাবটী অবশ্য অসঙ্গত নহে, কারণ দেহীর দেহরক্ষণোপযোগী খাদ্য ও পরিধেয় অর্থ বিনিময় ব্যতিরেকে পাওয়া যায় না। সে এইজন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল এবং মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিল, এই তপস্যার বলে ঈশ্বর অবশ্যই কোন গতিকে কিছু অর্থ আমাকে পাওয়াইয়া দিবেন। কিন্তু এরূপ প্রার্থনায় বা কল্পনায় তিনি কর্ণপাত করেন না। করেন না এইজন্য, সকলেই জানেন, তিনি আমাদিগের জন্য এই বসুন্ধরা ধনরত্নপূর্ণ করিয়া

রাখিয়া দিয়াছেন। আমরা অর্থকরী বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা শ্রম বিনিময়ে ঐ সমুদয় ধনরত্ন লাভ করিতে পারি। কিন্তু আমার অর্থোপার্জ্জনের উপযুক্ত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমি বিনা পরিশ্রমে অবৈধ ভাবে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলাম; এরূপ প্রার্থনা তিনি কখনই পূর্ণ করেন না। এরূপ অবৈধ হাস্যকর প্রার্থনার ব্যাপার পৌরাণিক গল্পে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কেবল ধ্যানযোগে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে বাহ্য বস্তু পাওয়া যায় না। তাঁহাকে অন্তঃকরণের সম্বল করিয়া নিয়ত অভাবজনিত প্রার্থনা ও তদনুযায়ী চেষ্টা দ্বারা তাহাতে সফলতা লাভ করিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে, তাহা হইলে প্রার্থনা নিষ্ফল হইবেনা। কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, যদি জীবনে উন্নতি লাভের আশা করিয়া থাক, তাহা হইলে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর।

বাস্তবিক ভজন সাধনের প্রধান উপকরণ হইতেছে প্রার্থনা। প্রার্থনা মৃতপ্রায় দেহে নবজীবন সঞ্চার করে, নিরাশার অন্ধকারে আশার আলোক জ্বালিয়া দেয়। জগতে যাহার অভাব আছে, সেই ব্যক্তিই ধন্য। ঈশ্বর তাহারই সকাতর ব্যাকুল প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভের পরম সহায় স্বরূপ প্রার্থনা বস্তুটী আমরা পাশ্চাত্য ইংরেজ জাতির সংমিশ্রণে তাঁহাদের সাধন প্রণালী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা ভারতীয় বৈদিক যুগের সাধন প্রণালীর অঙ্গীভূত থাকিলেও পূর্ব্বে ইহা অতি অস্ফুট ভাবেই ছিল। এই অনায়সলভ্য খাদ্য পরিধেয়াপূর্ণ ভারতবর্ষবাসীদিগের কোন পার্থিব বিষয়ের তাদৃশ অভাব ছিল না, সেই জন্যই প্রাচীন শাস্ত্রে প্রার্থনার

ভাব তত উজ্জ্বলভাবে দেখা যায় না। কিন্তু পাশ্চাত্য শীতপ্রধান দেশবাসীদিগের সাধন প্রণালীতে প্রার্থনার ভাব অতি প্রবলরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় অভাব ও আবশ্যক। তাঁহাদের দেশ আমাদের দেশের ন্যায় সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ও অনায়াসলভ্য খাদ্য পরিধেয় পূর্ণ নহে। সেখানে খাদ্য পরিধেয় সংগ্রহ পূর্ব্বক জীবন যাপন করা অতিশয় কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই অভাবমূলক কষ্টকর জীবনই তাঁহাদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। তাঁহাদের আরাধনাকালে সেই গির্জ্জায় গিয়া যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, তাঁহারা কিরূপ ব্যাকুলভাবে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই প্রার্থনা বলেই তাঁহারা আশায় বুক বাঁধিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আমাদের দেশে রাজত্ব করিতেছেন। আর হতভাগ্য আমরা প্রার্থনাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া নিরাশার কূপে ডুবিয়া, অদৃষ্টবাদ দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাঁহাদিগের দাসস্বরূপ পদলেহন করতঃ আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি। তাঁহাদিগের সেই অবিচলিত অধ্যবসায়, অদম্য সাহস, অসামান্য আত্মনির্ভরতা, বিলাসবিমুখতা ও অসীম কষ্ট সহিষ্ণুতা দেখিলে আমরা বিস্মিত হই। তাঁহারা ও আমরা এক মানুষ হইলেও ঈশ্বর যেন পৃথক উপাদান দিয়া তাঁহাদিগকে গড়িয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। এই যে পার্থক্য, ইহার কারণই হইতেছে, তাঁহাদের পশ্চাতে প্রার্থনার বল রহিয়াছে বলিয়া। অতএব সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিয়া প্রকৃত মনুষত্ব লাভ করিতে হইলে, প্রার্থনাকে জীবনের সঙ্গী করিয়া লইতে হইবে।

যদি জ্ঞানের অভাব হয়, তাহা হইলে একান্তমনে সেই পরম জ্ঞানময়ের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। এবং তাঁহারই অনুপ্রকাশরূপী জ্ঞানিগণের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ ও বিবিধ শাস্ত্ররাশি হইতে পরমার্থ তত্ত্ব লাভ করিতে হইবে। যদি প্রেম ও ভক্তির অভাবে প্রাণ শুষ্ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই অনন্ত প্রেমের প্রস্রবণ, পরম প্রেমময়ের নিকট প্রেম ভিক্ষা করিতে হইবে এবং প্রেমের বিকাশরূপী পিতামাতার নিঃস্বার্থ ও অকৃত্রিম স্নেহমমতা, বন্ধুদিগের প্রীতি ও হিতৈষীদিগের উপকারের বিষয় স্মরণ করিয়া প্রাণকে প্রেমে অভিষিক্ত করিতে হইবে এবং তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দানে আপনার ভক্তি বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। যদি বিবেক মলিন হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সুনির্ম্মল পবিত্রস্বরূপের নিকট মলিনতা দূর করিবার জন্য প্রার্থনা কর এবং তাঁহারই অবতাররূপী সাধু মহাত্মাদিগের নিকট সদুপদেশ গ্রহণে অন্তঃকরণের স্বচ্ছতা সম্পাদন কর। যদি পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাক, তবে ঈশ্বরের নিকট শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং জগদ্ব্যাপী তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বিবিধ রোগ প্রতিকারোপযোগী উপায় সমূহ অবলম্বন কর। যদি অর্থাভাবে দারিদ্র্য দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরম ঐশ্বর্য্যশালী মহিমার্ণবের নিকট প্রার্থনাপূর্ব্বক আপনার কর্ম্মশক্তি পরিচালনা দ্বারা বৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি দুঃখ নিবারণ করিবেন।

অতএব প্রার্থনাকে অবলম্বন করিয়া অনন্ত আশার আলোকে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা হইলে

তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহার সমীপস্থ হওয়া যাইবে অর্থাৎ তাঁহাকে লাভ করা যাইবে। অতঃপর তাঁহাকে লাভ করিয়া অর্থাৎ পাইয়া কি করিতে হইবে, এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। এই উপাসনা বস্তুটা কি তাহা অগ্রে দেখা যাউক, উপাসনা শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ উপ-আসনা, কাছে বসা, সমীপস্থ হওয়া। ভাবার্থ হইতেছে, তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া যাওয়া, তাঁহাতে লীন হওয়া, তন্ময় হওয়া অর্থাৎ একেবারে তাঁহার হইয়া যাওয়া। আর উপাসনা শব্দের দেশ-প্রচলিত অর্থ—ঈশ্বরের ধ্যান, ধারণা, পূজা অর্চ্চনা, স্তুতি বন্দনা, তপ, জপ, গুণকীর্ত্তন, রোজা, নামাজ, জিগির, ইত্যাদি সম্প্রদায় বিশেষের বিশেষ বিশেষ প্রণালী অনুযায়ী ঈশ্বরারাধনা। এই সমুদয় ব্যাপার ভাব ভক্তির উদ্দীপক ও ঈশ্বরলাভের সহায়। এই বিবিধ প্রকার উপাসনা বহুভাবাপন্ন হইলেও ইহার মূল উদ্দেশ্য তিন প্রকারে সাধিত হয়। যথা :—আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা। প্রথমতঃ আরাধনার অর্থ, তাঁহার অপার মহিমা ও অসীম করুণা-নিঃসৃত গুণাবলী স্মরণ ও কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। ইহাদ্বারা তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় হয়। যেমন কোন হিতৈষী ব্যক্তির হিতৈষিতামূলক সদ্ব্যবহারের কথা স্মরণ হইলে তাঁহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা আপনিই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, ঈশ্বর সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ। দ্বিতীয়তঃ ধ্যান অর্থাৎ মনে তাঁহাকে চিন্তা করা, জপ অর্থাৎ তাঁহার কোন নাম একাগ্রমনে নির্দ্দিষ্টরূপে উচ্চারণ করা, ইহাতে মনের মলিনতা ও চঞ্চলতা দূর হয়। তৃতীয়তঃ প্রার্থনা। ইহাতে মন, নিরাশার অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া, নব আলোক

লাভ করে। শৈথিল্য দূর হইয়া অন্তঃকরণে নব-বলের সঞ্চার হয়। কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও একাগ্রতা লাভ হয়। এই সমুদয় হইল সাধারণ উপাসনার উৎকৃষ্ট ফল। কিন্তু এই সমুদয় উপাসনা অধিকাংশ পরোক্ষ ভাবাপন্ন, সুতরাং এ গ্রন্থে উহার বিস্তৃতরূপে গুণ বর্ণনা করিবার স্থান নাই। ইহাতে প্রত্যক্ষ উপাসনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, উপাসনা শব্দের ভাবার্থ তন্ময়ত্ব লাভ অর্থাৎ তাঁহার হওয়া। সুতরাং তাঁহার হইয়া যাহা করা কর্ত্তব্য, যাহা করিতে হইবে, সেই কার্য্যই হইতেছে কর্ম্মগত প্রত্যক্ষ উপাসনা। এক্ষণে দেখা যাউক, তাঁহার হইতে হইলে আমাদিগকে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমতঃ তাঁহাকে জল, স্থল, শূন্যে সকল স্থানে সর্ব্বব্যাপীরূপে আমাদের প্রত্যক্ষের উপর সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান জানিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। অর্থাৎ আপনার বলিতে যাহা কিছু—নিরাকার, সাকারাদি বিবিধ সম্পদ, ধন, মান, যশ, পুত্র-কলত্র, আত্মীয়-বন্ধু, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি এবং আপনার জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযুক্ত দেহ পর্য্যন্ত তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে। আপনার ব্যক্তিগত আমিত্ব বা কর্ত্তৃত্ব, যাহাকে 'আমি' বলি তাহাও তাঁহাকে দিতে হইবে। কেবল ব্যবহারিক ভাবে জগতে নিজের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিবার জন্য, নাম মাত্রে, কথা মাত্রে 'আমি' শব্দটা রাখিয়া দিবে। এইরূপে যথাসর্ব্বস্বসহ আপনি তাঁহার নিকট অর্পিত হইলে তাঁহার হওয়া হইল। তখন আর আপনার বলিতে কিছুই রহিল না। এক্ষণে তাঁহার হইয়া তাঁহার কার্য্য যাহা করিতে হইবে, তাহাই হইতেছে উপাসনা। তাঁহার হইয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে হইবে।

তাঁহার ইচ্ছায় একেবারে গা ঢালিয়া দিতে হইবে। তখন আহার, বিহার, শয়ন, গমন, গ্রহণ, বর্জ্জন প্রভৃতি সাংসারিক সমুদয় ব্যাপারই তাঁহার উপাসনার অন্তর্গত জানিয়া তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া করিতে হইবে। তখন আর সাধকের নিজের বলিতে কোন কার্য্য থাকিবে না। তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। তাঁহার কার্য্য করিবার জন্য যাহা আবশ্যক হয়, তাহা তাঁহার নিকট প্রার্থনা পূর্ব্বক, অবস্থা বিশেষে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় কাণ পাতিয়া অনুগত ভৃত্যের ন্যায়, তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে। তিনি যখন যে আদেশ করেন বা যখন যে কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাহা প্রীতিকর হউক আর অপ্রীতিকর হউক, সুখ-সাধ্য হউক আর কষ্ট-সাধ্য হউক, সন্তুষ্ট-চিত্তে তাহা সমাধা করিতে হইবে। যেমন অপরাধিগণের ভাগ্যবিধাতারূপ কোন রাজপুরুষ বিচারাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলে, তাঁহার সম্মুখস্থ প্রহরী ও ভৃত্যগণ তাঁহার দিকে সচকিত নয়নে একদৃষ্টে তাঁহার আদেশ ইঙ্গিত গ্রহণের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকে, সেইরূপ বিশ্বশক্তিকে আমাদের সম্মুখে, অতি নিকটে, একেবারে চক্ষের উপর বর্ত্তমান, জানিয়া আমাদের সকল জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে তাঁহার আদেশ ইঙ্গিত পালনের জন্য সর্ব্বদা সতর্ক ও প্রস্তুত রাখিতে হইবে। ইহাই হইল কর্ম্মগত প্রত্যক্ষ উপাসনা। শাস্ত্র বলিয়াছেন :—তস্মিন্ প্রীতিস্তং প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনামেব। ইহার ভাবার্থ এই যে, তাঁহার সহিত প্রীতি স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। এক্ষণে দেখা যাউক, এই কথাটার মধ্যে কি আছে?

প্রীতিস্থাপনের ভাবার্থ হইতেছে ভালবাসার বিনিময় করা। ভালবাসা করা। কাহারও সহিত ভালবাসা করিতে হইলে তাঁহার নিকট সম্যক প্রকারে ভাল হওয়া চাই। কোন বিষয়ে কোন অংশে তাঁহার উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধার পাত্র হইলে আর তাঁহার ভালবাসা পাওয়া গেল না। অতএব কাহারও সহিত প্রীতি স্থাপন করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অনুমোদিত ভাবে, তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইয়া চলিতে হইবে এবং তাঁহার সন্তোষজনক যে কার্য্য অর্থাৎ যে কার্য্য তাঁহার অপ্রিয় নহে, সেই কার্য্য সাধন করিতে হইবে। সুতরাং বুঝিতে পারা গেল, উপরোক্ত শাস্ত্রীয় উপদেশমূলক শ্লোকটী কর্ম্মগত প্রত্যক্ষ উপাসনার আদর্শ স্বরূপ। কিন্তু এই সমুদয় বাহ্যজগতে সাধনীয়; কর্ম্মগত উপাসনা ব্যতীত অন্তর্জগতে তাঁহাকে জ্ঞানযোগে উপাসনা করিতে হইবে। ইহাকে আধ্যাত্মিক উপাসনা বলে। মানবমাত্রেই এই উপাসনা করিতে বাধ্য, ইহা না করিলে মানবাত্মা বহির্ম্মুখী হইয়া যায়। অন্তঃকরণের উৎকৃষ্ট বৃত্তিসমূহের অনুশীলন অভাবে বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয়। তাই কোন পাশ্চাত্য সাধু বলিয়াছেন, আধ্যাত্মিক উপাসনা আত্মার অন্ন। শরীরের ক্ষয় নিবারণ ও রক্ষণের জন্য যেমন আমরা বিবিধ খাদ্য পানীয় গ্রহণ করি, সেইরূপ আমাদের ব্যক্তিগত আত্মার দৈনন্দিন প্রাপ্ত সংসার কলুষিত মলিনতা দূর করিবার জন্য ও উন্নত আদর্শ লাভ করিবার জন্য আধ্যাত্মিক উপাসনার একান্ত আবশ্যক। ইহা না করিলে আত্মা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণ নিত্য নৈমিত্তিক প্রণালীবদ্ধরূপে আধ্যাত্মিক

উপাসনা করেন। যেমন হিন্দুদিগের ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী পাঠ ও মুসলমানদিগের দিবারাত্রিতে পাঁচবার নমাজরূপে উপাসনার ব্যবস্থা, এ সমুদয় আধ্যাত্মিক উপাসনা। এক্ষণে আধ্যাত্মিক উপাসনার কার্য্যপ্রণালী ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে, উপাসনার প্রথম অঙ্গ হইতেছে আরাধনা। আরাধনা অর্থ ঈশ্বরের অপার মহিমা ও অসীম গুণাবলী বর্ণনাপূর্ব্বক স্তুতি মিনতি সহকারে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে তাঁহার প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরতা উজ্জ্বল রাখা। ইহাতে যে তিনি কিছু উপকৃত হন তাহা নহে, এতদ্দ্বারা আমরাই উপকার প্রাপ্ত হই। সংসারের তাড়নায় আমরা নিয়তই ভক্তি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছি, এই জন্যই প্রতিদিন নিয়মিতরূপে তাঁহার গুণাবলী স্মরণপূর্ব্বক উক্ত ভক্তি বিশ্বাস পুনঃ স্থাপন করিবার জন্য আরাধনার আবশ্যক হয়। দ্বিতীয় অঙ্গ হইতেছে ধ্যান, নামজপ, ও কীর্ত্তন। ধ্যান অর্থ চিন্তা করা, ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে যে ধর্ম্মাবলম্বী যে ব্যক্তির যে প্রকার অভিজ্ঞতা ও ধারণা আছে, তাহাই অবিচ্ছিন্নরূপে একাগ্রমনে চিন্তা করা। তাঁহার কোন নাম অর্থাৎ যে নাম যাঁহার প্রিয়, সেইনাম পুনঃ পুনঃ নিয়মবদ্ধরূপে উচ্চারণ করা এবং কীর্ত্তন করা। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে মনঃ সংযম করা, মনের চঞ্চলতা দূর করা, মনের গ্লানি দূর করিয়া পবিত্রতা রক্ষা করা। আমাদের মন কখনও সংসারাসক্তি ও বিবিধ প্রলোভনে কলুষিত হইতেছে কখন বা শোক দুঃখে ম্রিয়মান ও হতাশ্বাস হইতেছে। কখন বৃথা আমোদে মত্ত হইয়া ঘূর্ণায়মান হইতেছে। মনের এতগুলি বিপরীত পথ-গামী দুরবস্থামূলক দুর্গতি নিবারণের কোন উপায় না করিলে

ক্রমান্বয়ে তামসিক ভাব প্রাপ্ত হইয়া পাশব প্রকৃতি অবলম্বন করে। সুতরাং মনকে সুস্থ রাখার জন্য উপরিউক্ত উপাসনা প্রণালী অবলম্বন করা বিশেষ আবশ্যক হইতেছে। তৃতীয় অঙ্গ হইতেছে প্রার্থনা। অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট আপনার অভাব ও আবশ্যকজনিত বস্তু চাওয়া। ইহা কেবল পার্থিব বস্তু নহে, সাকার নিরাকার সমুদয় সম্পদ সম্বন্ধে প্রার্থনা করা। এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য উন্নতিলাভ। এই প্রার্থনা দ্বারা আমরা উন্নতিলাভের চেষ্টা করিতে বাধ্য। না করিলে, অধঃপাতে যাইতে হইবে। পূর্ব্বাবস্থায়ও থাকা যাইবে না। কারণ জগৎ স্বভাবতই উন্নতিশীল। ইহা ক্রমবিকাশরূপে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছে। এই নিয়মের বশীভূত হইয়া অচেতন, সচেতন, উদ্ভিদ ইত্যাদি জগদীয় সমুদয় বস্তুই উন্নতির অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। এক্ষণে তুমি আমি যদি উন্নতির আশা ত্যাগ করিয়া যেখানে আছি সেইখানে থাকিতে চাই, তাহা হইলে তোমার আমার যাহারা সঙ্গী ছিল, তাহারা তো থাকিবে না, তাহারাও স্বাভাবিক নিয়মে উন্নতির পথে অগ্রসর হইল কেবল তুমি আমি পশ্চাৎ পড়িয়া গেলাম। সুতরাং তাহাদের তুলনায় আমাদিগকে অধঃপাতে যাওয়া হইল। এই কারণেই যিনি যে অবস্থায় আছেন, তাহাকে উন্নতির জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রার্থনা দ্বারা হৃদয়ে নববলের সঞ্চার হয়, নিদ্রিত শক্তি ও অন্তর্নিহিত অব্যক্ত শক্তি জাগরিত হইয়া প্রকাশিত হয়; মন হইতে ক্ষুদ্র আসক্তি প্রলোভনসমূহ দূর হইয়া মনে অবিচলিত অধ্যবসায় উৎপন্ন হইয়া কর্ম্মে উৎসাহিত করে। এইজন্য সেই অনন্তকে হৃদয়ের একমাত্র আদর্শ করিয়া প্রত্যেক মানব প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে আপনার

অভাবজনিত দৈন্যতা অনুভবপূর্ব্বক ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিয়া উপাসনা শেষ করিবেন। উপাসনার এই তিন অঙ্গের বিষয় পৃথকরূপে বুঝাইবার জন্য বর্ণিত হইল বটে, কিন্তু ইহার কোন অঙ্গ বাদ দিলে উপাসনা অপূর্ণ থাকিবে। সুতরাং আধ্যাত্মিক উপাসনা পূর্ণাঙ্গরূপে সাধন করাই মানবের কর্ত্তব্য।

এই আধ্যাত্মিক উপাসনা আমাদের দেশে বিবিধ ধর্ম্মে সাধারণতঃ দুই প্রকারে উপাসিত হয়। প্রথম প্রকার হইতেছে, গোপনভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া উপাসনা, ইহাকে নির্জ্জন উপাসনা বলে। ইহা সেই প্রাচীন আমলের হিন্দুদিগের চির প্রচলিত প্রথা। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম হইতে যে সমুদয় উপধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে তাদৃশ গোপন ভাব দেখা যায় না। তাঁহাদের উপাসনা স্বজন, নির্জ্জন দুই প্রকারেই সাধিত হয়। তাঁহারা কখনও নির্জ্জনে বসিয়া মনস্থির করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন, আবার কখন বা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবগণ ও ধর্ম্মবন্ধুদিগকে লইয়া একত্রে আরাধনা, ধ্যান, নামকীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি উপাসনা পূর্ণাঙ্গরূপে সাধনপূর্ব্বক মণ্ডলীবদ্ধরূপে আনন্দ সম্ভোগ করেন। বিদেশীয় ধর্ম্মাবলম্বী খ্রীষ্টান ও মুসলমান ভ্রাতাগণ মণ্ডলী সাধনের পক্ষপাতী ও মণ্ডলীসাধনপ্রিয়। তাঁহারা যে একেবারে নির্জ্জন উপাসনা করেন না তাহা নহে; স্ব স্ব অবকাশ ও রুচি অনুসারে নিয়মিতরূপে নির্জ্জন উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন লইয়া দলবদ্ধরূপে একত্র যোগে উপাসনা না করিলে তাঁহাদের চলে না। ইহা তাঁহাদিগকে করিতেই হইবে। এই মণ্ডলীভাবে উপাসনা খ্রীষ্টানধর্ম্মাবলম্বিগণ সপ্তাহে প্রতি রবিবারে তাঁহাদের ভজনালয়ে অর্থাৎ গির্জ্জায়

যাইয়া করিয়া থাকেন এবং মুসলমানেরা ঐ প্রকার সপ্তাহে প্রতি শুক্রবারে তাঁহাদের মস্‌জিদ বা খোদার ঘরে যাইয়া এইরূপে একত্রযোগে উপাসনা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ও তদুৎপন্ন শাখা সাম্প্রদায়িকগণ্ বিবিধ প্রকারে মণ্ডলীবদ্ধ উপাসনা করেন। সাধারণতঃ সমুদয় মণ্ডলী উপাসকগণই সমবেত উপাসনা-কারীদিগের সহিত একত্রযোগে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের নামগুণ কীর্ত্তন ও অধ্যাত্মিক ভাব সঙ্গীতাদি পরমার্থতত্ত্ব আলোচনাপূর্ব্বক বিমলানন্দ সম্ভোগ ও একত্রযোগে পানাহারাদি সমাপনান্তে, পরস্পর প্রীতিপ্রকাশরূপ প্রেমানন্দ উপভোগ করিয়া উপাসনা সম্পন্ন করেন। এইরূপ দেশীয় বিদেশীয় বহু উপাসক সম্প্রদায়ের নিয়মিতরূপ মণ্ডলী উপাসনাপ্রিয়তা দেখিয়া বোধ হয়, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকুমণ্ডলী—উপাসনাপ্রিয় ও উহার পক্ষপাতী। ইহা সমাজবদ্ধ মানবজাতির, ব্যক্তি ও সমাজগত উন্নতির, সহায়তা-কারক। মানব পরমুখাপেক্ষী সামাজিক জীব। পরস্পরের সহানুভূতিযোগে একত্র বাস করিয়া শিক্ষালাভ করা, সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করা, সমুদয়ই তাহাকে অন্যের সাহায্য লইয়া করিতে হয়, সে একাকী কিছুই করিতে পারে না। সুতরাং তাহাকে ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে সহায়তা না করিলে সে তাহা কোথায় পাইবে। এইজন্য বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, পাপী, তাপী, অজ্ঞান, ঘৃণিত সকলেই এই নিয়মবদ্ধ মণ্ডলী উপাসনার অন্তর্গত থাকিয়া ইহাতে যোগদান করিলে তাহাদিগের অনিচ্ছা ও অযোগ্যতা স্বত্বেও ধর্ম্মশিক্ষারূপ আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ হইয়া থাকে ; ইহাতে সাধারণভাবে সমাজ উন্নতিলাভ করে। আর নির্জ্জন উপাসনায় সেই পলায়িত ব্যক্তিমাত্র উন্নতিলাভ করে। অতএব দেখা

যাইতেছে যে, মানব যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক, তাহাকে সমাজবদ্ধরূপে মণ্ডলী উপাসনা করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। না করিলে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘনরূপ অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। ইহা যে ধর্ম্মে নাই, সে ধর্ম্ম ধর্ম্ম নহে। সে সমাজ বিচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ। সে সমাজ জীবিত থাকিলেও পরস্পর ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতায় অশান্তি পরিপূর্ণ। অতএব মনঃসংযমপূর্ব্বক নির্জ্জনে ধ্যানযোগে উপাসনা, আপনার ব্যক্তিগত উন্নতির সহায়রূপে যেরূপ আবশ্যক, আর সকলকে লইয়া একত্রযোগে মণ্ডলী উপাসনা করা সমাজগত উন্নতির পক্ষে তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক।

স্বরূপতত্ত্ব।

সত্যং জ্ঞানং অনাদি-অনন্তং অবিভাজ্যং অদ্বয়ং।
নিরাকারং, বিশ্বরূপং নিরপেক্ষং স্বাধীনং ॥
সর্ব্বজ্ঞং চিরজাগ্রতং, শান্তং, শিবং, সুন্দরং।
আনন্দরূপ-অমৃতং-প্রেমময়ং, প্রাণেশ্বরং ॥
সর্ব্বময়ং-ইচ্ছাময়ং-সর্ব্বকারণঃ কারণং।
নির্ব্বিকারং-পবিত্রঞ্চ সর্ব্বশক্তিমানং প্রভুং॥
জয় জয় জগদীশম্ ॥

সত্যং শব্দ অস্তিত্ব জ্ঞাপক অর্থাৎ যাহা নিশ্চিতরূপে আছে, পূর্ব্বে ছিল, পরেও থাকিবে। যাহার স্থায়িত্বে কোন সন্দেহ বা অবিশ্বাস নাই তাহাই সত্য। যাহা পূর্ব্বে ছিল না, মধ্যে আসিয়াছে, পরেও থাকিবে না, তাহা সত্য নহে। তাহা নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে বলিয়া মিথ্যা। জগৎ যে সৃষ্ট বস্তু, ইহাতে বোধ

হয় কাহারও সন্দেহ নাই। জগৎ শব্দ গমধাতু ক্বিপ্ প্রত্যয়, অর্থ, যে গমন করে; অর্থাৎ গতিশীল। জল, স্থল, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি লইয়া দৃশ্যমান জগৎ অবিরাম গতিতে কালের আশ্রয়ে গমন করিতেছে। কালও প্রবাহশীল। সুতরাং এই কালাশ্রিত জগতের গতি দেখিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি; যখন ইহার গতি আছে, তখন ইহার আরম্ভও আছে এবং শেষও আছে; এবং এই গতিশীল বস্তুর পরিচালক ও নিয়ামকরূপে, এই উৎপন্ন বস্তুর স্রষ্টারূপে কোন স্থিতিশীল বস্তু আছে। সেই কালাশ্রিত জগতের স্রষ্টা, পরিচালক ও নিয়ামক যিনি, তিনিই স্থিতিশীল সত্য বস্তু। তাঁহার গতি নাই, প্রবাহ নাই, আরম্ভ নাই, শেষও নাই। তিনি সৃষ্ট হন নাই এবং তাঁহার বিনাশও নাই। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালের নিয়ামকরূপে আপনার মহিমায় আপনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সত্যরূপে বিরাজিত আছেন। সেই পরম সত্যকে আশ্রয় করিয়া এই ক্ষয়শীল মিথ্যা জগৎ আমাদের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু এই সৃষ্টজগতের স্থায়িত্বরূপ বাস্তব সত্ত্বা নাই। সেই সত্যই সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, এখনও আছেন, পরেও থাকিবেন। ইহা আমরা সহজ জ্ঞানে বেশ বুঝিতে পারিতেছি। অতএব তিনি সত্যস্বরূপ। একমাত্র তিনি ভিন্ন যাহা কিছু সমুদয়ই আপাত সত্যরূপে প্রতীয়মান মিথ্যা বস্তু। বস্তুর গতিকে আমরা প্রত্যক্ষরূপে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি; কিন্তু উহাকে বিশ্লেষণ করিলে উহার প্রকৃত সত্ত্বা পাওয়া যায় না। যথা:—কোন বস্তুকে গমন করিতে হইলে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের আশ্রয়ে বহু দেশখণ্ড অতিক্রম করিতে হয় এবং

প্রত্যেক খণ্ডে তাহাকে থামিতে থামিতে যাইতে হয়; মনে কর, একটা কামানের গোলা পাঁচ মিনিটে তিন শত গজ যায়। সেই গোলাটী তাহা হইলে এক সেকেণ্ডে এক গজ যায়। এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, তাহাকে ঐ তিন শত গজ অতিক্রম করিতে হইলে প্রতি সেকেণ্ডে এক গজ পরিমিত স্থানে থামিতে থামিতে যাইতে হয়। এক্ষণে, ঐ সময় ও দেশকে বহু অংশে বিভক্তরূপে কল্পনা করিলে, প্রত্যেক পরিমিত সময়াংশে ও পরিমিত দেশখণ্ডে থামিতে থামিতে যাইতে হয়। তাহার উক্ত প্রত্যেক খণ্ডে স্থিতি কল্পনা না করিলে গতির পরিমাণ নির্ণয় করা অসম্ভব। এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, গোলাটীকে এরূপ বহু অর্থাৎ অসংখ্যবার থামিতে গেলে, গতির প্রকৃত সত্ত্বা কোথায় রহিল। এ সমুদয় দার্শনিক যুক্তির মধ্যে গেলে আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ঘুরিয়া যায়; অতএব সাদাসিধা, মোটামুটী ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। এই যে তাঁহার অস্তিত্ব বা স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস, মানব সাধারণ সকলেরই আছে সকল দেশের সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোক একবাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন যে, "ঈশ্বর আছেন।" কিন্তু এই স্বীকার বা এই বিশ্বাসের কোন গুরুত্ব নাই। কারণ তিনি যে কিরূপ ভাবে আছেন, এই সম্বন্ধে বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন বহু মত। ইহাই হইতেছে কঠিন সমস্যা। কেহ বলেন, তিনি কথায় মাত্র আছেন; কার্য্যতঃ তাঁহাদ্বারা কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। মানবের কর্ম্মই তাহার সুখ দুঃখ ভোগের কারণ, সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে ঈশ্বর থাকা আর না থাকা সমান কথা। সে থাকার কোন মূল্য নাই। কেহ বলেন, তিনি নিষ্ক্রিয়, সাক্ষীরূপে, দ্রষ্টা-রূপে এই জগতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তিনি নিজে কিছুই করেন

না বা করিতে পারেন না; প্রকৃতিই সমুদয় করেন। এরূপ ঈশ্বর বিশ্বাসেরও কোন গুরুত্ব নাই। কেহ বলেন, তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তৎসঙ্গে বিবিধ নিয়ম শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ সেই প্রাকৃতিক নিয়মে চলিতেছে। তিনি স্বর্গ নামক কোন কল্পিত স্থানে থাকিয়া মানবের ন্যায় জীবের পাপপুণ্যের হিসাব রাখিতেছেন এবং অবস্থাবিশেষে দণ্ডিত ও পুরস্কৃত করিতেছেন। কিন্তু মানব যখন অত্যন্ত মোহগ্রস্ত পাপী ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে, তখন স্বর্গে থাকিয়া আর তাহাদিগকে শাসন করিতে না পারিয়া, মানবরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধবিগ্রহাদি পূর্ব্বক পাপিগণকে বিনাশ করিয়া সাধুদিগকে রক্ষা করেন। কেহ বলেন, তিনি জগৎ সৃষ্টি করতঃ তৎসঙ্গে মানবদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া উপরিস্থ কোন অলক্ষিত স্থানে বসিয়া মানবের কর্ম্মফলের অর্থাৎ পাপপুণ্যের হিসাব রাখিয়া দিতেছেন; এদিকে মানব নিজের ইচ্ছামত তাহার জীবনপথে বিচরণ করিতেছে। ইহার পর যখন প্রাকৃতিক নিয়মে জগৎ লয় হইবে, তখন একটী বিস্তৃত ময়দানে সমুদয় মানবাত্মাগুলিকে একত্রিত করিয়া পূর্ব্বে রক্ষিত হিসাবের সহিত মিলন করিয়া, প্রত্যেক আত্মার পৃথক পৃথক দণ্ড বা পুরস্কার করিবেন। এখন যে যাহাই করুক, তিনি কাহাকে কিছু বলিবেন না। আবার কোন সম্প্রদায়ের মতে তিনি অলক্ষিতভাবে অন্তরীক্ষে অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বস্থানে অবস্থিত থাকিয়া সকলই জানিতেছেন, দেখিতেছেন। তাঁহাকে কোন বৃক্ষবিশেষে, কোন প্রস্তর খণ্ডে, অথবা কোন নির্ম্মিত মূর্ত্তিবিশেষে স্তুতি মিনতিপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া বিবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য, পানীয় ও গন্ধ দ্রব্যাদি উপহার প্রদান করিলে তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করেন

এবং আহ্বানকারী উপহারদাতার অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। এইরূপে মানবজাতি সেই আদিম বর্ব্বরাবস্থা হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মানব-প্রকৃতি ও জগৎ-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্বন্ধে যখন যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়া শাস্ত্ররূপে আদৃত ও গৃহীত হইয়া আসিতেছে। এই সমুদয় মত পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক আদৃত ও গৃহীত বলিয়া একান্ত নির্ভুল বলা যায় না। এই পুরাতনের মধ্যে ভ্রম কুসংস্কারের আবর্জ্জনা বহু পরিমাণ রহিয়াছে। ইহাতে এমন অনেক আপত্তিজনক ব্যাপার আছে, যাহাতে স্বাধীন মানবজ্ঞান তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস, এই প্রকার যে, ভ্রমপূর্ণই হউক, আর নির্ভুলই হউক, যাহা পিতৃ-পুরুষ কর্ত্তৃক সত্য বলিয়া গৃহীত ও আদৃত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে কোন বিধিব্যবস্থা সংযোগ, বিয়োগ বা পরিবর্ত্তন করিলে পূর্ব্বপুরুষের অবমাননা করা হয়। সুতরাং আমাদের যাহা আছে, তাহাই ভাল।

এইরূপে পূর্ব্বপুরুষের দোহাই দিয়া মানবের বিচার-বুদ্ধিকে ঢাকিয়া রাখিয়া অন্ধবিশ্বাসের বশীভূত হওয়া নিতান্ত আলস্যপরায়ণ বালকের ন্যায় কথা। পিতৃ-নির্ম্মিত পুষ্করিণীর আবর্জ্জনা তুলিয়া পরিষ্কার করিলে, পিতৃপুরুষের অবমাননা করা হয় না, বরং তাঁহাদের মুখোজ্জ্বল করা হয়। সন্দেহ ও অন্ধবিশ্বাসের বশীভূত হইয়া অবিচারে পুরাতনের পক্ষপাতী হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে তাঁহার সত্যতা বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্ব্ববাদীসম্মত মত যাহা তাহাই বলা যাইতেছে। সেই সত্য- স্বরূপ পরমেশ্বর অন্তরে বাহিরে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, জল, স্থল, শূন্যে নিত্য সত্য রূপে

অবিচ্ছিন্নভাবে সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার কোন কালে কোন স্থানে কোন প্রকার অন্তরাল, আবরণ বা অবকাশ নাই। তিনি পূর্ণরূপে, স্বপ্রকাশরূপে, সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন। তিনি সমুদয় প্রাণীতে, অচেতনে, স্থূলে, সূক্ষ্মে, আমাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বিষয় যাহা আছে ও যাহা হইতে পারে, তাহাতে সকল অবস্থায় সমানভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাই তাঁহার সত্যস্বরূপ। এই সত্যকে আমাদের আত্মার দিক হইতে অনুসন্ধান করিলেও বুঝিতে পারা যায়, আমরা যে আমিকে আমি বলিতেছি, অর্থাৎ আমরা ব্যক্তিত্বরূপে অনুভব করিতেছি, সেই আমির মূলও সেই একমাত্র নিত্য সত্য। আমি জন্মিবা-মাত্র বা জন্মিবার পূর্ব্বে আমাকে আমি বলিয়া জানিতে পারি নাই। চারি পাঁচ বৎসর বয়সে আমার একটু জ্ঞানের উদ্রেক হইলে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমি এক ব্যক্তি। ইহার পূর্ব্বে এই আমিটীর মূল কোথায় ছিল, কাহার নিকট ছিল? ছিল সেই মহা আমিতে; যে আমি হইতে সমুদ্রস্থিত জলবুদ্‌বুদের ন্যায় অসংখ্য জীবরাশি উৎপন্ন হইয়া সকলেই নিজ নিজ আমিত্ব অনুভব করিতেছে। সেই আমিই নিত্য সত্যরূপে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কালকে নিয়মিত করিয়া এই জগৎ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, তিনিই একমাত্র সত্যস্বরূপ। অতএব আইস পাঠক, আমরা তাঁহার প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য সকাতরে প্রার্থনা করি।

প্রার্থনা।

হে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর! তোমার সমীপে আমাদের মানব-জীবনের পরিত্রাণ ও উন্নতির জন্য কি প্রার্থনা করা

কর্ত্তব্য, তাহা আমাদের এই চঞ্চল ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে স্থির করিতে পারিতেছি না ; এই জন্য সহজ জ্ঞানে এই প্রার্থনা করি, যেন তোমাকে নিত্য সত্যরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমানতায় আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে পারি, আমাদিগকে এইরূপ শক্তি প্রদান কর। আমরা যেন পুরাতনে, নূতনে, অতীতে, বর্ত্তমানে, ভবিষ্যতে, নিদ্রায়, জাগরণে, সম্পদে, বিপদে কোন অবস্থায় তোমাকে না হারাই। তুমি আমাদিগকে এইরূপ স্মৃতি প্রদান কর। আমরা যেন জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক চিন্তায়, প্রত্যেক বাক্যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দ্বারে তোমাকে প্রত্যক্ষরূপে, বর্ত্তমানরূপে অনুভব করিতে পারি। হে সত্যদেব, তুমি সকল আকাশ ও সকল কাল পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ। জড়জগতের প্রত্যেক অণুতে তুমি, চেতন জগতের প্রত্যেক প্রাণে তুমি, অন্তর্জগতের প্রতি চিন্তায় তুমি, সত্যরূপে বিরাজিত থাকিয়া তোমার অপার মহিমার পরিচয় প্রদান করিতেছ। অতএব হে প্রভু ! আমরা যেন কোন অবস্থায় তোমার সত্যতায় অবিশ্বাস না করি। ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

স্বরূপতত্ত্ব।

জ্ঞানং—জ্ঞান শব্দের সাধারণ অর্থ, যদ্দ্বারা কোন বিষয় অবগত হওয়া যায়, জানা যায়। ইহাকে চৈতন্যও বলে। জ্ঞাত বস্তু, জ্ঞান ও জ্ঞাতা, এই তিন লইয়া জ্ঞান ক্রিয়া সাধিত হয়। জ্ঞাতা জ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞাত বস্তু জানেন। সুতরাং জ্ঞাতা জ্ঞানের পরিচালক। কিন্তু জ্ঞানকে ছাড়িয়া জ্ঞাতার কোন অস্তিত্ব থাকে না। কারণ, জ্ঞানই জ্ঞাতার সর্ব্বস্ব।

সুতরাং জ্ঞান ও জ্ঞাতা একই বস্তুর দুই দিক্। ইহাদিগকে পৃথক করা যায় না। আবার জ্ঞাত বস্তু জ্ঞাতাকে ছাড়িয়া বা জ্ঞানকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, কারণ জ্ঞানের বাহিরে বস্তু থাকা অসম্ভব। কিন্তু জ্ঞানরূপী, জ্ঞানের কর্ত্তারূপী জ্ঞাতা যিনি, তিনি জ্ঞাত বস্তুকে ছাড়িয়া থাকিতে পরেন। তিনি থাকেন তাঁহার নিজের মহিমায়, তাঁহার জ্ঞানে। সুতরাং জ্ঞাত বস্তুরূপ-বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত জ্ঞানের পরিচালকরূপী জ্ঞাতা যিনি, তিনি অনন্ত জ্ঞানময়ং। জ্ঞানই তাঁহার স্বরূপ।

আমরা যখন জ্ঞানের কথা চিন্তা করি, তখন আমাদের অন্তঃকরণে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব আলোকের জ্যোতি আসিয়া প্রতিভাত হয়। এই জ্যোতি কোথা হইতে আসিল? ইহা আসিল, সেই জগদ্ব্যাপী পরম চৈতন্য হইতে। সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা হইয়া নিদ্রিত হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে জাগরিত হইয়া আমার সেই পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান, যাহা নিদ্রার সঙ্গে হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম। আমি চক্ষু মেলিলাম না, কোন বাহ্য বস্তুর সাহায্য লইলাম না, অথচ আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনা আপনি সমুদয় জ্ঞান অবিকৃত অবস্থায় ফিরাইয়া পাইলাম। ইহা নিদ্রার সময় কাহার নিকট কোথায় কি অবস্থায় ছিল? কে আমাকে পুনরায় ফিরাইয়া দিলেন? এই সমুদয় তত্ত্ব গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, এই জ্ঞান সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যরূপে অবিচ্ছিন্ন ভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানসিন্ধু হইতে বিন্দুরূপে জ্ঞানকণিকা আমাদের দেহযন্ত্রের মধ্য দিয়া জাগরিত অবস্থায় প্রতিফলিত হয় এবং নিদ্রিত অবস্থায় প্রতিফলিত হয় না। সুতরাং সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান

আমাদের ব্যক্তিত্বের দিক হইতে নিজস্ব নহে। উহাতে আমাদের সাময়িক অধিকার মাত্র। তাহাও শারীরিক অবস্থার অন্তর্গত। যেমন আমাদের দেহের মস্তিষ্ক নামক যন্ত্র বিকৃত হইলে কি নিদ্রায়, কি জাগরণে, কোন অবস্থায় আমাদের জ্ঞানে অধিকার থাকে না। এতদ্দ্বারা বুঝা গেল, যে, জ্ঞান তাঁহার নিজের মহিমায়, স্বপ্রকাশরূপে স্বস্বরূপে সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত আছে। আবার আমার জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, তাঁহার জ্ঞান একত্র যোগ করিলে তিনটী জ্ঞান হয় না, ঐ এক জ্ঞানই হইবে।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, জ্ঞানবস্তু এক, অখণ্ড; সূর্য্য যেমন সৌরজগতকে স্বীয় রশ্মিদ্বারা আলোকিত করেন, সেইরূপ এই অখণ্ড অনন্ত জ্ঞানময় স্বপ্রকাশরূপে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন। সূর্য্যের আলোকের অন্ধকার আছে, কিন্তু এই জ্ঞানালোকের অন্ধকার নাই। তিনি জলে, স্থলে, আকাশে, পাহাড়ে, পর্ব্বতে, বনে, জঙ্গলে, মানবের অগম্য ও অজ্ঞাত স্থানে সর্ব্বত্র সমানভাবে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞানের মহিমা ব্যক্ত করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র কীটাণুর পক্ষে অসম্ভব। বাহ্য-জগতের যে দিকে, যে অংশে, ক্ষুদ্র বৃহৎ যে বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহাতেই তাঁহার অদ্ভুত জ্ঞান-লীলার পরিচয় পাওয়া যায়। কি প্রাণিজগৎ, কি জড়জগৎ, কি আণুবীক্ষণিক জীবজগৎ সর্ব্বত্রই তাঁহার অদ্ভুত কৌশল সম্পন্ন জ্ঞানলীলার মহিমা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। মানব বোধ হয়, অদ্যাপি তাঁহার জ্ঞান-লীলার লক্ষাংশের একাংশেরও রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই। মানবের বিজ্ঞান দিন দিন যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ঈশ্বরের বিচিত্র লীলার রহস্য ততই বিস্তৃত ও দূরস্থ

হইয়া কঠিন আকার ধারণ করিতেছে। আপাততঃ স্বীয় দেহ যন্ত্রের অদ্ভুত কৌশলের বিষয় চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে দেহটাকে, আমার দেহ বলিয়া আমরা বহন করিয়া লইয়া বেড়াইতেছি। উহার সহিত আমরা কতদূর পরিচিত। উহা যখন সেই জননী জঠরে সঙ্কীর্ণ জরায়ু মধ্যে নিবিড় অন্ধকারে অবস্থান করিতেছিল, তখন কে উহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে এখনও আমরা দেহরক্ষার জন্য বনের ঘাসপাতা ফলমূল খাইতেছি, উহা কি কৌশলে রক্তে পরিণত হইয়া আমাদের দেহ রক্ষা করিতেছে, ইহা কি আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারি !

তবে আমাদের অর্থাৎ মানবের সৌভাগ্য এই যে, তাহার অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের স্ফুলিঙ্গরূপী এক বিন্দু জ্ঞানকণিকা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার এই অসীম ও বিচিত্র জ্ঞানলীলা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই জন্যই সেই অনন্ত জ্ঞান-ময়ের অনুপ্রকাশরূপী মানব, জীব-জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং তাঁহার বিচিত্র মহিমা বিস্তার করিয়া ধন্য হইতেছে। এই যে সেই জ্ঞানময়ের অনুপ্রকাশরূপী মানব-জ্ঞান, ইহার দুইটী দিক্ আছে। একটী সসীম আর একটী অসীম। বাহ্যজগতের দিকে মানব-জ্ঞান সসীমভাবাপন্ন। সে বাহ্যজগৎ হইতে জানিয়া চিনিয়া বুঝিয়া তাহার স্বীয় অভিজ্ঞতা দ্বারা যতদূর আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, সেই পর্য্যন্তই তাহার জ্ঞানের সীমা। কিন্তু তাহার অন্তর্জগতের দিকটা অসীম, উন্নতিশীল ও অনন্ত আশাযুক্ত। সে যে অবস্থায়ই থাকুক, তদপেক্ষা আরও জ্ঞানোন্নতি সাধন পূর্ব্বক অগ্রসর হইবে, এরূপ একটী আশার

আলোক নিয়তই তাহার অন্তরে জ্বলিতেছে। এ আলোক দেহান্তেও বোধ হয় নির্ব্বাণ হইবে না। এই জন্যই সাধু মহাত্মারা বলিয়াছেন, আত্মা অনন্ত উন্নতিশীল। মানব-জ্ঞানের এই অসীমের দিকটাই সেই জ্ঞানময়ের আধ্যাত্মিক লীলাক্ষেত্র। এই অসীম জ্ঞানের আলোকে মানব উন্নতি লাভ করে। ইহাই মানবের সাধনের পথ। এই অসীমকে বুদ্ধিযোগে স্পর্শ করিলে মানব-জীবন ধন্য হয়। তাহার তখন বাহ্যজগতে সসীম বলিয়া যাহা বদ্ধমূল ধারণা ছিল, তাহা অসীমের আশ্রিত ও অন্তর্গত জানিয়া আত্মা তখন ঐ সসীমের মধ্য দিয়া অসীমকেই দেখে। তখন সসীমের সত্ত্বা, আর তাহার নিকট প্রকৃত সত্ত্বা বলিয়া ধারণা থাকে না। তখন অন্তরে বাহিরে সকল স্থানে সেই অসীম অখণ্ড অনন্ত জ্ঞানময়ের প্রকাশ দেখিয়া মানব সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। তখন তাহার ব্যক্তিগত জ্ঞান যাহা আমার জ্ঞান বলিয়া ধারণা ছিল, তাহা সেই অসীম অনন্ত জ্ঞানেরই অনুপ্রকাশ বলিয়া বুঝিতে পারিল। বাহ্যজগতের সহিত যে ব্যবহার বা কর্ম্ম নিজের বলিয়া করিতেছিল, তাহা এখন অসীমের অধীন হইয়া, তাঁহারই কর্ম্ম জানিয়া করিতে লাগিল। তাহার সেই সসীম ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র আমিত্ব বা কর্ত্তৃত্ব; সেই বিশ্বকর্ত্তার কর্ত্তৃত্বের সহিত মিশিয়া এক হইয়া গেল। মানবাত্মার এই যে অবস্থাপ্রাপ্তি ইহাই মুক্তি।.

সাধকের এই অবস্থায় ঈশ্বরোপাসনা ও সাংসারিক কার্য্য সমুদয়ই অসীম ভাবধারণ করিল। তিনি পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া জীবন্মুক্তরূপে এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। অসীম জগৎ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইল। আমিত্বের যে ক্ষুদ্র গণ্ডী ছিল তাহা

ভাঙ্গিয়া গেল। সুতরাং তাঁহার কর্ম্মত্যাগ করা ত দূরের কথা, কর্ম্ম আরও বাড়িয়া গেল। এক্ষণে প্রত্যক্ষ জগতের সমুদয় বিষয়ে সেই অনন্ত জ্ঞানময় কি ভাবে তাঁহার জ্ঞানলীলা প্রকাশ করিতেছেন, তাহা তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া লইবার আবশ্যক হইল। তিনি সংসারাসক্তি ও পাপপ্রবৃত্তিকে পদদলিত করিয়া ক্রমোন্নতিশীল এক পরম সুখের রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সপ্রেম কর্ত্তব্য ব্যবহারে বাহ্যজগতের সুখ-সম্পদ আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়া মনুষ্য সমাজের উচ্চ আদর্শস্বরূপ দেবত্ব লাভ করিলেন। ইহাই অসীম জ্ঞানময়ের সাধকের উৎকৃষ্ট আদর্শ। অনেকের মত ও বিশ্বাস এই যে, ধর্ম্ম রক্ষা করিতে গেলে সংসারী লোকের অনেক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ঈশ্বর বিবিধ কষ্ট ও যাতনা দিয়া সাধকের মন পরীক্ষা করেন। সুতরাং সৎপথে থাকিয়া সংসারী করা চলে না। এই মতটী অতি ভ্রান্ত ও কুসংস্কারযুক্ত। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পাপরূপ হুতাশনকে আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক আমরা ধ্বংসের পথে চলিয়াছি। ঈশ্বর যে সাধককে দুঃখ যন্ত্রণা দিয়া পরীক্ষা করেন, এ কথাটা কতদূর সত্য, তাহা দেখাযাউক। পরীক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে, পরীক্ষার্থী তাহার পরীক্ষিত বিষয় আয়ত্তাধীন করিতে পারিয়াছে কিনা, তাহা জানা এ কথাটা, সসীম ক্ষুদ্র বুদ্ধিযুক্ত মানবের পক্ষেই শোভা পায়। যিনি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, যিনি সকলই জানিতেছেন, তিনি আবার পরীক্ষা করিয়া কি জানিবেন। সুতরাং ইহা ভ্রান্ত মত।

প্রকৃত কথা হইতেছে, ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে সংসার দাসের

ন্যায় সেবা করিয়া সুখের অধিকারী করিয়া থাকে। তিনি সুখ না চাহিলেও অনায়াসলভ্য দুঃখের ন্যায় সুখ আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে। ইহা অতিশয় সত্য কথা। ধর্ম্মপথের পথিক ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির নূতন নূতন দুঃখ-যন্ত্রণা আসিয়া উপস্থিত হয়, আর ন্যায়পরায়ণ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর তাঁহার ভক্তকে দুঃখ দিয়া তামাসা দেখেন, ইহার ন্যায় অসম্ভব আর কি হইতে পারে? কোন ব্যক্তি ধর্ম্মপথে উঠিলে যে সমুদয় দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হয়, সে যে পূর্ব্বাবস্থায় থাকিলে তাহার সে সমুদয় দুঃখ কষ্ট হইত না, ইহার প্রমাণ কি?

আমার বোধ হয়, সুখ-লালসাপ্রিয় মানব যদি একটু ধর্ম্মের আভাস পাইয়া নিয়মিতরূপে ঈশ্বরোপাসনা করিতে থাকে, তখন তাহার মনে এইরূপ একটা ধারণা দাঁড়ায় যে, উপাসনা করিয়া ঈশ্বরের কত উপকার করিতেছি, তাঁহার নাম প্রতিদিন শত সহস্র বার জপ করিয়া তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছি। তদ্ভিন্ন নিয়ত তাঁহার প্রশংসা ও গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিপত্তি কত পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দিতেছি। আপনার সুখ, স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দাসত্বরূপে তাঁহার কার্য্য করিতেছি। সুতরাং এরূপ অবস্থায় কর্ম্মগতিকে একটু কিছু সাংসারিক দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হইলে, অমনি সাধক ঈশ্বরের উপর বিরক্ত হইয়া পড়েন। তখন বলেন, হে ঈশ্বর! আমি তোমার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতেছি, তুমি আমার প্রতি এই কঠোর নির্ম্মম ব্যবহার করিলে! বেশ, তুমি আমাকে পরীক্ষা কর, কিন্তু আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না।

পাঠক এক্ষণে সূক্ষ্মরূপে বুঝিয়া দেখুন, এইরূপ ধারণা

নবীন সাধকের মনে উপস্থিত হইতে পারে কি না? কিন্তু এইরূপ ধারণার আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ভ্রমপূর্ণ। যিনি ধর্ম্মপথে উঠিয়া ঈশ্বরানুগত্য লাভ করিয়া মনে ভাবেন যে, আমি ঈশ্বরের ব্যাগার দিয়া উপকার করিতেছি এবং তাঁহার সাধন করিয়া প্রিয়পাত্র হইতেছি; তাঁহার এখনও গোড়ায় অনেক গলদ আছে। যাহা হউক, ধর্ম্মপথে উঠিলে সাংসারিক দুঃখভোগ করিতে হয়, আর অধর্ম্মাচরণে সুখে থাকা যায়, ইহা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। তবে ঐরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক আলস্যপরায়ণ দুর্ব্বলচিত্ত লোক ধর্ম্মপথটাকে কণ্টকাকীর্ণ মনে করিয়া ঐ পথ হইতে বিরত হয় এবং তাহাদের মানব-জীবনের ভাবী উন্নতির আশা এককালে তিরোহিত হয়। সুতরাং এরূপ ভ্রান্ত সংস্কারের পোষকতা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে সেই পরম জ্ঞানময়ের জ্ঞানকণিকা অন্তঃপ্রকাশরূপে কিরূপে মানবে অভিব্যক্ত হয়, সেই সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, চারিটী লইয়া আমাদের অন্তকরণ ইহাকে সূক্ষ্ম দেহ বলে। মনের কার্য্য চিন্তা করা, ইচ্ছা করা, মনন করা; বুদ্ধির কার্য্য বিচার করা; অহঙ্কারের কার্য্য কর্ত্তৃত্ব করা ও চিত্তের কার্য্য ধারণা করা অর্থাৎ কোন বিষয় স্মরণ করিয়া রাখা। বুদ্ধির বিচারের ক্ষমতা থাকিলেও উহার চৈতন্য নাই। শৃগাল, বানর কাক প্রভৃতি নিকৃষ্ট জন্তুর বেশ বুদ্ধি আছে, কিন্তু উহাদের চৈতন্য নাই। এই জন্যই বুদ্ধিকে জ্ঞান বলা যায় না। বুদ্ধি বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া আত্মার নিকট আনিয়া দেয়, আত্মা তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ব্বাচন

করে। যাহার বুদ্ধিশক্তির যত সূক্ষ্মত্ব ও নিপুণত্ব আছে,—সে তত জ্ঞানলাভ করিতে পারে। সুতরাং আমরা যাহাকে আমাদের জ্ঞান বা বিবেক বলি, তাহা বুদ্ধিশক্তির সাহায্যে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ হইতে লাভ করিতে হয়। কিরূপে জ্ঞান লাভ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভাব আবশ্যক জনিত দুঃখ কষ্টবোধ, বিবিধ ভোগেচ্ছার তৃপ্তিজনিত সুখ বোধ ইত্যাদি বুদ্ধিশক্তির সহিত দ্রুতবেগে বিকাশ হইতে লাগিল। বৎসরান্তে একদিন দেখা গেল; শিশু প্রদীপের আলোক ধরিতে গিয়া হাত পুড়াইয়া ফেলিয়াছে। সে ঐ আলোকটীর বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া উহাকে গ্রহণ করিবার জন্য স্পর্শ করিয়াছিল, সেইজন্য হাত পুড়িয়া গেল। কিন্তু উহা যে দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট অগ্নি, উহাদ্বারা দগ্ধ হইতে হয়, সে জ্ঞান শিশু তখন লাভ করিতে পারে নাই। এখন বুঝিতে পারিল যে, ঐরূপ আলোকে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান পরিস্ফুট হইতে লাগিল, তখন বুঝিতে পারিল যে, ওরূপ আলোকে অগ্নি থাকে বলিয়া উহাদ্বারা দগ্ধ হইতে হয়। ঐ অগ্নি আমাদের নিত্য আবশ্যকীয় পরমোপকারী পদার্থ। উহা দ্বারা যে দগ্ধ হইতে হয়, সে কেবল আমাদের ব্যবহার দোষে। ইহা হইল বিজ্ঞান লাভ। বিশেষ বিশেষ বস্তুর গুণ ক্রিয়া অবগত হওয়ার নাম বিজ্ঞান লাভ। তিনি জগতের প্রত্যেক বস্তুতে গুণ ক্রিয়ারূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার অপার মহিমার পরিচয় দিতেছেন। আমাদের যতক্ষণ জীবন, তখন বাহ্য বস্তুর

সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। সুতরাং যখন যে বস্তু আমাদের সম্মুখে ব্যবহার জন্য উপস্থিত হইবে, তৎপ্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য সেই সেই বস্তুর গুণ ক্রিয়াদি জানিবার আবশ্যক হয়। এই জন্যই বিজ্ঞান বা বিশেষ বিশেষ বস্তুর গুণ ক্রিয়া সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করা মানব মাত্রেরই নিতান্ত প্রয়োজন। আবার ঐ বিশেষ বিশেষ বস্তুতে প্রকাশিত ভিন্ন ভিন্ন রূপ গুণ ক্রিয়া যে এক অখণ্ড জ্ঞাতার একই উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী জ্ঞান ক্রিয়া প্রকাশের ফল; ভিন্নত্ব, বিশেষত্ব যে কেবল প্রকাশে; ব্যবহার জন্য; এই যে সারতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা, ইহাই পরমার্থ জ্ঞান। এই পরমার্থ জ্ঞানই মানব জ্ঞানে ক্রমশঃ বাহ্যজগৎ হইতে অভিব্যক্ত হইয়া অসীম ভাব ধারণ করে। এক্ষণে এই সমুদয় আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারা গেল যে, মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে পরমার্থজ্ঞান ও বিজ্ঞান এই দুইটীই সাধনবলে লাভ করিতে হইবে। এই দুইটীর কোনটী পরিত্যাগ করিলে তজ্জনিত শাস্তিভোগ করিতেই হইবে। ইহাতে বিনিময় চলিবে না। এস্থলে একটী গল্পের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

কোন সময়ে আমাদের বাসস্থান ও তাহার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে সংক্রামকরূপে বিসূচিকা রোগ উপস্থিত হওয়ায়, অনেক লোকের আকস্মিক মৃত্যু দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলাম। আমি একজন ঈশ্বরের পরম ভক্ত; তপ, জপ, পূজা, অর্চ্চনা, ত্রিসন্ধ্যা নিয়মিতরূপে করিয়া থাকি। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই; কাযেই ঐ সমুদয় ঈশ্বরোপাসনামূলক ক্রিয়াকলাপের মাত্রা খুব বৃদ্ধি করিয়া দিলাম এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, যখন তাঁহার জন্য এতটা পরিশ্রম

করিতেছি, তখন নিশ্চয়ই তিনি আমাদিগকে এই করাল ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। দুই তিন দিনের মধ্যেই বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি লোক ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া শমনসদনে গমন করিল এবং সেই পীড়িতদিগের পরিত্যক্ত বিছানা বস্ত্রাদি নিকটস্থ পুষ্করিণীর জলে পরিষ্কার করা হইতে লাগিল; ক্রমশঃ অল্প দিনের মধ্যেই ঐ ভয়ঙ্কর ব্যাধি বিস্তৃতি লাভ করিয়া আমার বাটীস্থ ও অন্যান্য কতকগুলি আত্মীয়-স্বজনকে গ্রাসে করিয়া লইয়া গিয়া আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দিল। তখন আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উন্মত্তের ন্যায় হইলাম। তপ, জপ সমুদয় আমার ভুল হইয়া গেল। অকস্মাৎ কোন রাজকীয় চিকিৎসক আসিয়া আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিলেন যে, ঐ পুষ্করিণীর জল বিষাক্ত হইয়া রোগ বিস্তার করিতেছে। সুতরাং ঐ জল ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়ায় অল্প দিনের মধ্যেই উক্ত সংক্রামক ব্যাধি অদৃশ্য হইল। তখন আমি প্রকৃতিস্থ হইয়া বুঝিতে পারিলাম যে, মানবীয় বিজ্ঞানকর্ত্তৃক ঐ রোগের প্রতিষেধক উপায় যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা না জানার জন্যই ঐ শাস্তিভোগ করিতে হইল। ইহাই আমার প্রধান ক্রটী। এইরূপ বিজ্ঞান জানা অন্ততঃ আত্মরক্ষার জন্যও কর্ত্তব্য।

এই ক্রটীর পরিবর্ত্তে ঈশ্বরকে ডাকিলে তিনি তাহাতে দয়া করেন না। ইহার জন্য শাস্তিভোগ করিতেই হইবে। এস্থলে ইহা বলা হইতেছে না যে, বিপদকালে ঈশ্বরকে ডাকিলে তিনি দয়া করেন না, বিজ্ঞানের দ্বারাই রক্ষা পাওয়া যায়; তাহা নহে। যে বিপজ্জনক বিষয়টা আমাদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্যের

আয়ত্তাধীন, অর্থাৎ যে বিষয় চেষ্টা করিলে আমরা নিস্তার পাইতে পারি, তাহাতে তিনি দয়া করেন না। যেখানে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান শক্তি-সামর্থ্যের শেষ সীমা, অর্থাৎ যে বিপদে আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি, ক্ষমতা পরাস্ত হয়, আমরা উহা নিবারণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হই, সেইখানেই তাঁহার বিশেষ কৃপার আরম্ভ। সেইখানেই তিনি তাঁহার অদ্ভুত বিজ্ঞানবলে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। এই জন্যই লোকে বলে, "নচ দৈবাৎ পরং বলং"। কিন্তু সেটা সাধারণ ভাবে নয়। অতএব মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে, পরমার্থ জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই দুই বিষয়েই অভিজ্ঞতা লাভে যত্নবান হইতে হইবে। কিঞ্চিৎমাত্র পরমার্থতত্ত্ব লাভ করিয়া সংসার ধর্ম্মে শৈথিল্য প্রকাশ করা, আলস্যপরায়ণ ও ব্যক্তিগত সুখসম্ভোগাভিলাষী মূর্খের কার্য্য।

অনেক ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়, একটু পরমার্থ জ্ঞানের আভাস পাইয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়া বসেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বরকে লাভ করাই কর্ম্মজীবনের উদ্দেশ্য সুতরাং ঈশ্বরকে যখন অন্তরের মধ্যে পাইয়াছি, তখন আর বাহিরে কর্ম্ম করিবার আবশ্যক নাই; এক্ষণে তাঁহাকে লইয়া আনন্দ সম্ভোগ করি। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে পরিবারবর্গকে পথে তুলিয়া, বৃদ্ধ পিতামাতাকে অন্নবস্ত্রের ক্লেশে পতিত করিয়া, সন্ন্যাসী সাজিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া বসেন। কিন্তু সংসার তাঁহাকে ছাড়ে না। মানবদেহ স্বভাবসুলভ ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি সমুদয় আসক্তি-প্রবৃত্তি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া যায়। কাজেই দুই একদিন নির্জ্জন বাসের পর, উদরের যন্ত্রণা অসহ্য বোধ হওয়ায় প্রবঞ্চনামূলক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সাধারণ

লোকদিগকে ঠকাইয়া তাহাদের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক খাদ্য, পরিধেয় সংগ্রহ করতঃ সেই নির্জ্জন সংসার রক্ষা করেন। কেহ বা ফুলপড়া, তেলপড়া, জলপড়া ও বিবিধ মুষ্টিযোগাদি অবলম্বন করিয়া একটা ডিস্পেন্সরি খুলিয়া দিলেন, ওদিকে পরিত্যক্ত পরিবারবর্গ অন্নবস্ত্রের ক্লেশে দুঃখের সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। এই সমুদয় লোক যে কর্ম্মজড়, আলস্যপরায়ণ, সংসারভীরু, ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘনকারীরূপে সম্পূর্ণ অপরাধী, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে যাঁহারা জ্ঞানোন্নতি সাধনের জন্য জনকোলাহল পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে মনঃসংযম করতঃ জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া সংসারদগ্ধ মানব চিত্তে শান্তিবারি সিঞ্চন করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। যেমন বুদ্ধ, চৈতন্য, মহম্মদ, যীশু ইত্যাদি মহাপুরুষগণ সংসারের জন্যই, সংসারী লোকের দুঃখ নিবারণ জন্যই, সংসার ত্যাগ করিয়া নিৰ্জ্জনে বাস করিয়াছিলেন। পরে জ্ঞানামৃত সঞ্চিত করিয়া, পুনরায় সংসারে আসিয়া সেই অমৃত বিতরণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা ঈশ্বরের অবতার এবং আমাদের পূজনীয় ও পরমোপকারী। আমরা তাঁহাদের নিকট ঋণী।

এক্ষণে জ্ঞান স্বরূপের সাধারণ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা যাহা আমরা পূর্ব্বপুরুষ হইতে পাইতেছি, তাহাই কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। শাস্ত্রকারেরা বলেন, আমরা বাহ্যজগৎ হইতে তিন প্রকারে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভ করি ; যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবচন। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ঘটিত জ্ঞান, যথা—দেখা, শুনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি। এই জ্ঞানে বস্তুর বাহ্য স্বরূপ দেখাইয়া দেয় মাত্র ; এই ইন্দ্রিয়ঘটিত জ্ঞান দ্বারা বস্তুর গুণ ক্রিয়াদি জানা যায় না।

বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ ও গুণ ক্রিয়াদি জানিতে হইলে অনুমান ও আপ্তবচন এই দুইটীর সাহায্য লইতে হয়। অনুমান অর্থ কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ দ্বারা অনুভব করিয়া আপনার বুদ্ধিগত বিচারের সাহায্যে সেই বস্তুর গুণ ক্রিয়াদি প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাকে অনুমানসিদ্ধ জ্ঞান বলা যায়। যেমন মেঘ দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান। প্রত্যক্ষ, একখানি মেঘকে কৃষ্ণবর্ণ একটা ছাউনীরূপে দেখাইয়া দেয়। বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায়, উহা জলীয় বাষ্পরাশি, উহা হইতে বৃষ্টি পতনের খুব সম্ভাবনা। অতএব আকাশে উত্থিত মেঘ দেখিয়া অনুমান করা গেল যে, শীঘ্রই বৃষ্টিপাত হইবে। এক্ষণে আপ্তবচনের কথা বলা হইতেছে। আপ্তবচন অর্থ ঋষিবাক্য, জ্ঞানীর বাক্য; জ্ঞানী ব্যক্তির অভিজ্ঞতালব্ধ অভিমত। এই আপ্তবচন বলিতে বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় শাস্ত্রকে বুঝায়। এই সমুদয়ই দ্বিতীয় ব্যক্তির বিচারলব্ধ জ্ঞান। জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে মানবকে এই আপ্তবাক্যের সাহায্য লইতেই হইবে। কারণ, মানব সসীম ক্ষুদ্র জীব, তাহার পক্ষে অনন্ত বিষয়ের জ্ঞান, অনুমান ও বিচার যোগে লাভ করা অসম্ভব। এইজন্য তাহাকে জ্ঞান লাভের জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। যদি পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে মুনি, ঋষি, মৌলবী, পীর, পয়গম্বর, পাদ্রী ইত্যাদি ধর্ম্মচর্চ্চাকারী জ্ঞানিগণের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের সঞ্চিত উপদেশরাশি, যাহা শাস্ত্ররূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে; তাহা হইতে পরমার্থতত্ত্ব সংগ্রহ করিতে হইবে। যদি দেহ

রক্ষার জন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কিছু অধিকার লাভ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে শারীরবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের নিকট শিক্ষালাভ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের বিজ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা-পূর্ণ শাস্ত্র হইতে শারীরতত্ত্ব, বাহ্যবস্তু সম্বন্ধীয় দ্রব্যগুণতত্ত্ব, বিবিধ পীড়ার প্রতিকারোপযোগী চিকিৎসাতত্ত্ব ইত্যাদি হইতে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সংগ্রহ করিতে হইবে। এইরূপ অন্যান্য বৈষয়িক জ্ঞানলাভেরও ঐ প্রণালী। অর্থাৎ তাঁহার এই বিচিত্র জগৎরূপ বাজারে যে দোকানে যাহা বিক্রয় হইতেছে, সেই দোকান হইতে তাহা ক্রয় করিতে হইবে। বস্ত্র বিক্রেতার নিকট মিষ্টান্ন চাহিলে সে দিতে পারিবে না।

এক্ষণে বুঝিতে পারা গেল যে, আপ্তবচন বলিতে সকল প্রকার বিজ্ঞানশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্ঞানী ও গুরুজনদিগের উপদেশ, এই সমুদয়কে বুঝায় এবং ইহার সাহায্য ব্যতীত মানবের জ্ঞান লাভের আর কোন পন্থা নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা মস্ত কথা আছে; সে কথাটা হইতেছে এই—শাস্ত্রমাত্রই অভ্রান্ত হইতে পারে না। কারণ, সমুদয় শাস্ত্রই ভ্রমপ্রমাদজড়িত বিস্মৃতিশীল মানব কর্ত্তৃক রচিত। অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডাররূপ বিশ্বরাজ্যে, সসীম মানবজ্ঞান যে অপূর্ণতা দোষে দূষিত, ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না; এইজন্যই, মানবের রচিত বলিয়াই সকল স্থলে শাস্ত্র অভ্রান্ত হইতে পারে না। এ কথাটী মূল্যবান ও আবশ্যকীয়। আবার অনেক স্থলে শাস্ত্রবাক্য অভ্রান্ত হইয়াও দেশ কাল অবস্থার পরিবর্ত্তনে, উহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং শাস্ত্রবাক্য বা কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির অভিমত গ্রহণ করিতে হইলে আপনার অন্তরস্থিত স্বাধীন বিবেকের সহিত মিলাইয়া দেখিলে যদি গ্রহণ

যোগ্য হয়, তাহা হইলে গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা তাহা অবিচারে আপনার বিবেকের অসম্মতিতে, অন্ধ বিশ্বাসের অধীন হইয়া গ্রহণ করা মানবের পক্ষে কখনই কর্ত্তব্য হইতে পারে না, যে শাস্ত্র বা উপদেশ, আপনার স্বাধীন বিবেকে অনুমোদন করে না, যে বিশ্বাস সন্দেহের দৃষ্টিতে গ্রহণ করা যায়, তাহাকে অন্ধ বিশ্বাস বলে। ইহার ফলও অত্যন্ত সন্দেহজনক। সুতরাং শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। যেন ভ্রম কুসংস্কারে পতিত হইয়া অশাস্ত্রকে শাস্ত্র ও অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা না হয়। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, উচ্চ অঙ্গের শাস্ত্র যাহা, তাহা সমুদয় ঈশ্বরের বাণী ; তাঁহার মুখনিঃসৃত। যেমন হিন্দুর বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। গীতার উপদেশগুলি স্বয়ং ভগবান্ দিয়াছিলেন। কোরাণের উপদেশগুলি স্বয়ং খোদার নিকট হইতে তাঁহার দোস্ত মহম্মদ শুনিয়া তাহা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। বাইবেলের উপদেশগুলি স্বয়ং ঈশ্বর যীশুর নিকট বলিয়াছিলেন। এই ভাবটী প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে যদি অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তাহা আমি ভঙ্গ করিতে চাহি না, কারণ আমি এই পুস্তকের স্থানান্তরে বলিয়াছি যে, তাঁহার অনিচ্ছায় একটী তৃণও নড়ে না, পাতাও পড়ে না। সুতরাং শাস্ত্রগুলি যে তাঁহার ইচ্ছাপ্রসূত, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তবে তিনি যে অশরীরী, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তিনি কিরূপে শাস্ত্র বলেন, কিসের সাহায্যে বলেন। অবশ্য তাহা হইতে পারে না, তবে আপত্তিকারী এস্থলে বলিবেন যে, তিনি সংসারের পাপ নিবারণ জন্য স্বয়ং অবতাররূপে মানব-

জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক শরীর ধারণ করিয়া এই সমুদয় উপদেশরাশি বিতরণ করিয়াছেন। এ কথাও যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার মানবজন্ম গ্রহণে মানবত্ব লাভরূপ অপূর্ণতা ও ভ্রম-প্রমাদাদি দোষযুক্ত হওয়া অপরিহার্য্য। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, যাহা ভাষা দ্বারা লিখিত ও পঠিতরূপে ব্যক্ত হয়, যাহা অন্য কর্ত্তৃক বাক্যদ্বারা ব্যক্ত হয়, তৎসমুদয়ই মানবের জ্ঞান-বিজ্ঞানবলে রচিত। সুতরাং তাহাতে ভ্রম-প্রমাদ ও অপূর্ণতা দোষ থাকা অসম্ভব নহে।

এক্ষণে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধে পুনরায় কিছু বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রত্যেক মানবকে, শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণে ভ্রমে পতিত হইবার ভয়ে যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন বিশেষ আবশ্যক, সেইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধেও আমাদের সর্ব্বদা সাবধান থাকা বিশেষ আবশ্যক। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বভাবই যেন মানবকে ভ্রমে পতিত করা, যথাঃ—ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, একটা প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপতুল্য ছাউনী আমাদের মস্তকোপরি বিস্তৃত। তাহার গাত্রে অসংখ্য হীরকখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে। প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিক হইতে একখানা রূপার থালার ন্যায় দীপ্তিময় পদার্থ উঠিয়া ক্রমান্বয়ে আমাদিগের পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতঃ পশ্চিমদিকে অস্ত যায়; ইহা ভিন্ন প্রত্যক্ষ আর আমাদিগকে কিছুই দেখাইয়া দিতে পারে না। এক্ষণে ঐ আকাশ ও সূর্য্যের প্রকৃত স্বরূপ যদি জানিতে চেষ্টা না করা যায়, তাহা হইলে উহাদের প্রতি প্রত্যক্ষ দৃষ্টিজনিত যে বিশ্বাস, উপরে বিবৃত হইল, ঐরূপ বিশ্বাসে আমাদের জীবন কাটিয়া যাইবে। নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরকে ডাকিলে তিনি আমাদিগকে ঐ ভ্রম সংশোধন করিয়া

দিবেন না। সুতরাং আমাদিগকে ঐ চাক্ষুষ ভ্রম নিরাকরণ জন্য বাহ্যজগৎ হইতে জ্ঞানিগণের উপদেশ, বিবিধ শাস্ত্রীয় যুক্তি গ্রহণ ও জগদ্ব্যাপারের সহিত ঐ আকাশ ও সূর্য্যের কার্য্যকারিতা আলোচনাপূর্ব্বক বিচার দ্বারা এই মীমাংসায় উপনীত হইতে হইবে যে, শূন্যময় আকাশে উদিত সূর্য্য আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা বহুত্তর গুণে বৃহৎ তেজোময় পদার্থ এক স্থানেই রহিয়াছে। আমরাই উহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক ঘুরিতেছি। উহা কেবল যে আমাদিগকে আলোক দানে সাহায্য করিতেছে, তাহা নহে; উহার সহিত আমাদের দেহের ও পৃথিবীর কার্য্যকারণসূত্রে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে যে, সূর্য্য না থাকিলে খাদ্যাভাবে আমরা জীবিত থাকিতে পারিতাম না এবং এই সুন্দর সুশৃঙ্খলাপূর্ণ পৃথিবী, একটা কদর্য্যময় জড়পিণ্ডরূপে পরিণত হইয়া মনুষ্যাবাসের অনুপযুক্ত হইত। সুতরাং প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে যাহাকে গতিশীল ক্ষুদ্র জড়পিণ্ডরূপে দেখা হইয়াছিল, তাহাই এখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অতি বৃহৎ স্থিতিশীল, বহুগুণযুক্ত জগতের সহিত কার্য্যকারণসূত্রে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, আমাদিগের পরমোপকারী বস্তুরূপে প্রতিপন্ন হইল। আবার এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আরও জ্ঞানলাভ হইল যে, যিনি আমাদের দেহের ও বাহ্যজগতের সৃষ্টি, রক্ষা ও পালনকর্ত্তা; তিনিই এই সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, নিয়ামক, পরিচালক। সুতরাং সূর্য্যও যাঁহার, আমিও তাঁহার, জগৎও তাঁহার এবং আমি, সূর্য্য ও জগৎ সেই এক অখণ্ড জ্ঞানময়ের আশ্রিতরূপে ও তাঁহারই জগৎকার্য্যের সহায়তাকারীরূপে আমরা সকলেই তাঁহার আদেশ পালন করিতেছি। সুতরাং সূর্য্য ও আমরা পরস্পর ব্যষ্টিভাবে প্রকাশে ভিন্ন হইলেও সমষ্টিভাবে কার্য্যকারণসূত্রে

মূলে একই। একেরই প্রকাশময় স্বরূপ। ইহাই হইল পরমার্থ জ্ঞান। হিন্দুশাস্ত্রে আত্মজ্ঞানের বিষয় যাহা বর্ণিত আছে, তাহা পরমার্থ জ্ঞানেরই নামান্তর মাত্র। আত্মজ্ঞান অর্থেই আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান, অর্থাৎ আমি কি? আমি যদি মনুষ্য হই, তাহা হইলে প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শ কিরূপ, তাহা জানা আবশ্যক হয়। আমি সাকার কি নিরাকার? আমি কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইতে হইবে। আমাকে এই মানব-জীবনে কি করিতে হইবে। এই সমুদয় আত্মজ্ঞানের শিক্ষনীয় বিষয়; সুতরাং ইহাকে ধর্ম্মতত্ত্ব, পরমার্থতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব বলা যাইতে পারে। এই জ্ঞান লাভে যাহার চেষ্টা ও যত্ন নাই, এই জ্ঞান যে কিছুমাত্র লাভ করিতে পারে নাই, সেই হতভাগ্য জীব মনুষ্য হইয়াও পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট। যে আপনাকে চিনিতে পারে নাই যে নিজে কি বস্তু, তাহার কি কর্ত্তব্য, তাহা জানিতে পারে নাই, সে পরকে অর্থাৎ জগৎকে চিনিবে কিরূপে। অতএব, আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি, মহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হইলেও মানব-সমাজে তাহার মূল্য নাই। মানবের আত্মজ্ঞান আছে বলিয়াই সে ঈশ্বরের অনুপ্রকাশরূপে কল্পিত হইয়া জীবজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। অতএব মানব মাত্রকেই উন্নতিলাভ করিতে হইলে ও তাহার মানবত্ব বজায় রাখিতে হইলে আত্মতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞানসাধনে নিয়ত চেষ্টা করিতে হইবে। এই অনন্ত জ্ঞানময়ের বিচিত্র স্বরূপ অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া ব্যক্ত করা সসীম মানবের পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার হইলেও তাঁহার করুণা কণা স্বরূপ যেটুকু জ্ঞানালোক তিনি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বলিতে

পারা যায় যে, মানবের ঈশ্বরের স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভের যত প্রকার কল্পিত শাখা আছে, তন্মধ্যে এই জ্ঞান স্বরূপের সাধনা ও উপাসনাই সর্ব্বপ্রধান। ইহা প্রত্যক্ষ উপাসনার ভিত্তি। অতএব পাঠক! যদি পরোক্ষ উপাসনামূলক অন্ধ বিশ্বাসের স্তর হইতে স্বপ্রকাশ জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত প্রত্যক্ষ সাধন দ্বারা হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে চাও, তবে আইস, আমরা জ্ঞানময়ের নিকট জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করি।

প্রার্থনা।

হে পরম জ্ঞানময়! তুমি যে আমাদের অন্তঃকরণে অণু-প্রকাশরূপে তোমার অনন্তজ্ঞানের কণিকামাত্র প্রদান করিয়া তোমরা এই বিচিত্র জ্ঞানলীলার অসীমত্ব অনুভব করিতে সমর্থ করিয়াছ, এই জন্যই আমরা তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তুমিই আমাদের একমাত্র সার বস্তু; এইজন্য তোমার নিকট একান্তমনে এই প্রার্থনা করি যে, তুমি অবিচ্ছিন্নভাবে আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদের অজ্ঞানান্ধতাজনিত ভ্রম-প্রমাদ কুসংস্কার হইতে রক্ষা কর। আমরা যেন ক্ষণকালের জন্যও তোমাকে হারাইয়া অজ্ঞান না হই, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। আমরা পার্থিব পদার্থ হারাইয়া কত হায় হায় করি, কিন্তু তোমাকে পদে পদে হারাইয়া মৃত্যুরূপ অধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতেছি, তাহা আমরা আদৌ বুঝিতে পারি না। অতএব তুমি আমাদিগকে এইরূপ বল দান কর, যেন তোমার জ্ঞানময় প্রকাশকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতে পারি এবং জ্ঞানালোকে তোমার সেবায় এ জীবন উৎসর্গ করিতে পারি। হে পরম

পিতা! আমরা যেন অজ্ঞানতামূলক অন্ধবিশ্বাসোৎপন্ন কুসংস্কার জালে জড়িত হইয়া তোমাকে বিস্মৃত না হই এবং তোমার নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপকে কলঙ্কিত না করি, তুমি আমাদিগকে এই সুযোগ প্রদান কর। তুমি আমাদিগকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দিয়া বিবিধ সুখ-সম্পদের অধিকারী করিয়া পরম সুখী করিয়াছ; কিন্তু ইহা যে তোমারই করুণার ফলস্বরূপ তোমারই দান; ইহার অন্তরালে যে তুমি থাকিয়া, তোমার কার্য্য করিয়া লইতেছ, ইহা যেন আমরা সকল অবস্থায় বুঝিতে পারি। আমরা যেন তোমার অধীনতা অস্বীকার করিয়া আপনার ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে প্রবল করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজে না করি, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। হে প্রভু! তুমি যেমন আমাদিগকে স্বাধীনতা দানে সুখী করিয়াছ; সেইরূপ আবার উহার অপব্যবহারজনিত সর্ব্বনাশের দ্বারও উন্মুক্ত রহিয়াছে। তুমি যদি আমাদিগকে পশু বা উদ্ভিদ্‌রূপে সৃষ্টি করিতে, তাহা হইলে আমরা তোমার হাতের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া তোমার কার্য্য করিয়া যাইতাম। কিন্তু তুমি আমাদিগকে মানবরূপে সৃষ্টি করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দিয়া আমাদের জীবন এরূপ দায়িত্ব-পূর্ণ করিয়াছ যে, আমরা তোমাকে ধরিয়া চেষ্টা ও সাধনবলে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া স্বর্গের দেবতারূপে পরিণত হইতে পারি। আবার তোমাকে ছাড়িয়া অজ্ঞানতার কুহকে পড়িয়া আপনার ব্যক্তিগত সুখ-স্বার্থের বশীভূত ও বিবিধ প্রলোভনযুক্ত সংসারাসক্তিতে প্রমত্ত হইয়া নরকের কীটরূপে পরিণত হইতে পারি। অতএব জ্ঞানময়! তোমার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা, যেন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

বা অহঙ্কারকে তোমার আদেশ ইঙ্গিত পালনে, তোমার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে পারি। তুমি আমাদিগকে এই সুযোগ প্রদান কর। হে মহিমাময় মহাত্মন্! তুমি আমাদিগকে তোমার অসীম জ্ঞানজ্যোতিঃ সাগর হইতে আলোকবিন্দুবৎ, জ্ঞানকণিকা প্রদান করিয়া, তোমার অপার মহিমার পরিচয় প্রদান করিয়াছ; এক্ষণে প্রার্থনা করি, যেন তোমার এই মহৎ দানের প্রতিদানরূপ কৃতজ্ঞতাপ্রকাশমূলক ভক্তি ও প্রেম তোমার প্রতি আমাদের নিয়তই বর্ত্তমান থাকে। তুমি আমাদের মনোহর গৃহতুল্য এই দেহ; মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া, কি অদ্ভুত কৌশল দ্বারা তাহাতে আত্মা স্থাপন করতঃ জীবিত রাখিয়াছ; তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না; ধন্য তোমার জ্ঞানলীলা, ধন্য তোমার অদ্ভুত কৌশল। তোমারই করুণাবলে ধীশক্তিসম্পন্ন প্রশান্তমতি ধার্ম্মিকেরা এই ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব-প্রকৃতির মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; এই জন্যই আমরা তাঁহাদের সঞ্চিত জ্ঞানরত্ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। এক্ষণে আমরা এই প্রার্থনা করি, যেন সেই পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত শাস্ত্রের ভ্রম কুসংস্কার অপনোদন করিয়া তোমার জ্ঞানের মহিমার নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদিগের মুখোজ্জ্বল করিতে পারি। হে অনন্ত-জ্ঞানময়! আমরা যেন সংসারের তাড়নায় প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তোমার জ্ঞান হইতে বিচ্যুত না হই। তুমি আমাদের অন্তরে বাহিরে সকল জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারে বর্ত্তমান থাকিয়া আমা-দিগকে তোমার আদেশ পালনের সুযোগ করিয়া দেও।

হে মহিমার্ণব! তুমি আমাদিগকে তোমার জ্ঞানের মহিমার প্রকাশস্বরূপ, যে ন্যায়পরতা বৃত্তি প্রদান করিয়াছ, উহার

যেন আমরা সর্ব্বদা উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা তোমার মহিমা বিস্তার করিতে পারি। ঐ যে পতঙ্গ আলোকের দোষ গুণ বিচার করিতে না পারিয়া রূপজ মোহে মুগ্ধ হইয়া অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল, আমরা যেন ঐরূপ পতঙ্গের দশা প্রাপ্ত না হই; ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আমাদের মন যেন সাবধানতা সহকারে সততই তোমাতে লিপ্ত থাকে। প্রত্যেক বাক্যে, কার্য্যে, চিন্তায়, যেন সর্ব্বদা তোমাকে অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। তুমি আমাদিগের সমুদয় ইন্দ্রিয় দ্বারে জ্ঞানবিজ্ঞানরূপে প্রকাশিত থাকিয়া আমাদিগকে বিবিধ পাপ প্রলোভন হইতে রক্ষা কর। তোমার অনুকম্পায় আমরা বিদ্যা, ধন, মান, যশ ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য বহু ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখী হইয়াছি। তজ্জন্য প্রার্থনা করি, যেন ঐ সম্পদে মত্ত হইয়া তোমাকে ভুলিয়া না যাই। আমরা যেন ঐ সকল সম্পদকে বিপদ অপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ চিন্তার বিষয় বলিয়া মনে করি। উহা যে তোমারই দান, তোমার কার্য্যেই নিয়োজিত করিতে হইবে, এই জ্ঞান যেন সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ পথে বর্ত্তমান থাকে। আমাদের যাহাতে ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও অধর্ম্মে অশ্রদ্ধা জন্মে, তুমি আমাদিগকে সেই সুযোগ প্রদান কর। আমরা যেন জ্ঞানদৃষ্টিতে তোমাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে এই সংসারের খেলা সাঙ্গ করিয়া তোমাকেই প্রাপ্ত হইতে পারি, ইহাই আমাদের শেষ প্রার্থনা।

স্বরূপতত্ত্ব।

অনাদি অনন্ত—তাঁহার আদিও নাই, অন্তও নাই; আরম্ভও নাই, শেষও নাই। আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান যাহা আমরা

জন্মের পর পাইয়াছি, এই জ্ঞান যে জন্মের পূর্ব্বে এই জগতে ছিল, ইহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই জ্ঞান পূর্ব্বে না থাকিলে, এক্ষণে আমরা পাইলাম কোথা হইতে আবার যে জ্ঞানাধীনে আমি উৎপন্ন; রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছি, আমার পূর্ব্বপুরুষগণও ঐ জ্ঞানাধীনে উৎপন্ন, প্রতিপালিত ও রক্ষিত হইয়া মানবলীলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই দৃশ্যমান জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই তাঁহার অদ্ভুত জ্ঞানলীলার পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জ্ঞান বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এই জ্ঞানের আরম্ভ কোথায় তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। এস্থলে আমাদের বুদ্ধি আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া পরাস্ত স্বীকার করিল। সুতরাং নির্ণীত হইল যে, সেই সত্যস্বরূপ জ্ঞানময়ের আরম্ভ নাই। এইজন্য তিনি অনাদিস্বরূপ। আমাদের দেহ পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞান লয় হইয়া যাইবে না, এই জগৎ লয় হইলেও এই অনন্ত জ্ঞান-রাশির লয় হইবে না, তখন স্বপ্রকাশরূপে, স্বস্বরূপে, আপনার মহিমায় অবস্থান করিবে; ইহাই আমরা বুদ্ধিদ্বারা অনুমান করিতে পারিতেছি। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ইহা কার্য্যের ক্রমিক ধারা। কিন্তু কার্য্য মাত্রেই কর্ত্তার অধীন না হইয়া সম্পন্ন হইতে পারে না। আবার সেই কার্য্যের আরম্ভ হইতে শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তার কখনও লয় হয় না। কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বেও কর্ত্তা যে অবস্থায় ছিলেন, কার্য্য শেষ হইবার পরেও সেই অবস্থায় থাকিবেন, ইহা সহজেই অনুমিত হইতেছে। সুতরাং কর্ত্তা যিনি তাঁহার আরম্ভ ও শেষরূপ কার্য্যগত অবস্থান্তর প্রাপ্তি

অসম্ভব ও স্ববিরোধী। কারণ কর্ত্তা স্বয়ং আরম্ভ ও শেষরূপ কর্ম্মের অধীন হইলে, তাঁহার আর কর্ত্তৃত্ব রহিল না। অতএব সকলের কর্ত্তা যিনি, তিনি অনাদি ও অনন্ত। এই সমুদয় গেল দার্শনিক যুক্তির কথা। এক্ষণে একবার সেই অনাদি অনন্তকে অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগতের দিক হইতে অনুসন্ধান করা যাউক। আমরা বিষয়কে যত বড় করিয়া ভাবি না কেন, উহা জ্ঞানাধীন করিয়া ভাবিতে হয়। উহা জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না; জ্ঞান সর্ব্বদাই অনন্তভাবে বিষয়ের বাহিরে বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করিয়া অবস্থান করে। সুতরাং আমাদের জ্ঞান যাহা, তাহা অনন্ত ভাবাপন্ন, সেই অনন্তের অনুপ্রকাশরূপে, তাঁহার অনন্তস্বরূপের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আবার অন্তঃকরণের অন্যান্য বৃত্তিসমূহ যথা, চিন্তা, আশা, কল্পনা প্রভৃতি সমুদয়ই অনন্তভাবাপন্নরূপে সেই অনন্তস্বরূপের মহিমা ব্যক্ত করিতেছে। বহির্জগতের যেদিকে দৃষ্টি করা যায়, সমুদয়ই অনন্তের প্রতিমূর্ত্তি-রূপে আমাদের নেত্রপথে আবির্ভূত হয়। কি প্রাণিজগৎ, কি জড়জগৎ, কি উদ্ভিদ্‌জগৎ, সকলেই তাঁহার অনন্তত্বের প্রমাণ করিতেছে।

যদি বিচারের দিকে না যাইয়া কেবল প্রত্যক্ষ দ্বারা দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে একবার মস্তকোপরি আকাশমণ্ডলস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে দৃষ্টিপাত কর। কাহার সাধ্য আছে, উহা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারে। পণ্ডিতেরা বিজ্ঞানবলে অনুমান করিয়াছেন যে ঐ সকল নক্ষত্রের মধ্যে কেহ কেহ এত-দূরে আছে যে, তাহাদের আলোকরশ্মি পৃথিবীতে পড়িতে দশ বৎসর সময় লাগে। আবার ঐ সমুদয় নক্ষত্র এক একটী,

আমাদের পৃথিবী ও সূর্য্য হইতে লক্ষ লক্ষ গুণ বৃহৎ। আমাদের এই পরিদৃষ্ট সৌর জগতের ন্যায় অপরিজ্ঞাত আরও কত সৌর জগৎ আছে, তাহা কে বলিতে পারে? আবার সূক্ষ্মত্বের দিক হইতে দেখিলেও ঐরূপ অনন্তের পরিচয় পাওয়া যায়। একটী সূচ্যগ্রে যতটুকু জল থাকিতে পারে, তাহাতে অনুমান দশ লক্ষ কীটাণু অবস্থান করে। ইহাও আনুবীক্ষণিক জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের কথা। আবার স্থূল জীব ও জড়জগতে যে দিকে দেখ, ঐ অনন্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। পদতলস্থ পিপীলিকা শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয়, উহা গণনা করিয়া শেষ করা মানুষের অসাধ্য। সামান্য একটী গাছের পাতা, গণনা করিয়া শেষ করা একেবারে অসাধ্য না হইলেও অতিশয় দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ঐরূপ গাছ কোথায় কত আছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে; তাঁহার লীলার আশ্রয়রূপী কাল ও আকাশ ইহারা প্রত্যক্ষভাবেই অনাদি অনন্তের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মানবের বিজ্ঞান ও নানা প্রকার বিদ্যাগত বিষয়-সমূহও অনন্ত। সৃষ্টির আদি হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কোন মানব কোন বিজ্ঞান, কি বিদ্যাগত বিষয়ের অন্ত পান নাই। এইরূপ আমাদের প্রত্যক্ষ, অনুমান ও কল্পনাগত যাহা কিছু সবই অন্তহীন। এই বিবিধ প্রকার জীবগণ, যেন সেই অনন্তের অনন্ত সংসার-সাগরে সন্তরণ খেলিতেছে। প্রকাশশীল বস্তুসমূহ অনন্ত সমুদ্রের জলবুদ্‌বুদের ন্যায় অসংখ্যভাবে প্রকাশিত হইয়া আবার ঐ অনন্তে বিলীন হইতেছে। অতএব আমরা বুঝিলাম, তিনি অনন্তস্বরূপ, তিনিই আমাদের সাধনীয় ও আদর্শ। সুতরাং আর আমরা সসীম বিষয়ে আসক্ত হইয়া অনন্তকে ভুলিব না।

এখন হইতে আমরা প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক চিন্তায়, সেই অনন্তের অনুসরণ করিব। আইস পাঠক, এক্ষণে সেই অনন্তকে আদর্শ করিয়া হৃদয়ে স্থাপনের জন্য তাঁহার নিকট সকাতরে প্রার্থনা করি।

প্রার্থনা।

হে অনন্ত দেবতা! তোমাকে নমস্কার; যাহাতে আমরা তোমার প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভর রাখিয়া, তোমাকে জীবনের আদর্শ করিয়া সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারি, তুমি আমাদিগকে সেই সুযোগ দান কর। আমরা যেন বিষয়-জগতের প্রত্যেক বস্তুতে, প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক চিন্তায়, তোমার বর্ত্তমানতা অনুভব করিতে পারি। আমাদের আশা, ভরসা, বিশ্বাস যেন সম্যক্ প্রকারে তোমাকেই নির্ভর করে। আমরা যেন তোমাকে ভুলিয়া কোন পরিমিত বস্তুর উপাসনা করিয়া তোমার মহত্ত্বের সঙ্কোচ সাধন না করি। তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। তুমি সর্ব্বব্যাপী সকলের আশ্রয় হইয়াও আমাদের অজ্ঞানতার অন্তরালে রহিয়াছ। অত-এব প্রভু, তুমি আমাদের সঙ্কীর্ণতা ও অজ্ঞানতা হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে তোমার করিয়া লও। আমরা যেন আপাত-সুখকর ও পরিণাম-বিরস দুঃখের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ বিষয়-সুখে মত্ত হইয়া তোমাকে ভুলিয়া না যাই। আমাদের ভক্তি, প্রীতি, প্রেম প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তিসমূহ যেন তোমার অনন্ত ভাবের দিকেই ধাবমান হয়। হে প্রভু! তুমি আমাদের চক্ষুর চক্ষু হইয়া চক্ষুর উপর থাকিয়া তোমার অনন্ত মহিমা ব্যক্ত করিতেছ; কিন্তু আমরা তোমাকে চিনিতে না পারিয়া

তোমাকে বৃক্ষ, প্রস্তর ও ক্ষুদ্র পুত্তলিকার মধ্যে পুরিয়া আমাদের ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ করি। তুমি আমাদের এই সমুদয় অন্ধ-বিশ্বাস হইতে মুক্ত কর। হে অনন্ত মহিমাময়! তুমি আমাদিগকে অনন্ত আশার আলোক প্রদান করিয়া আমাদের ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতামূলক জ্ঞান ও ইচ্ছাকে তোমার দিকে টানিয়া লও। আমরা যেন তোমার অনন্ত শক্তির সাহায্যে এই ক্ষুদ্রতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া পর পর উন্নত অবস্থা লাভ করিয়া তোমার মহিমা বিস্তার করিতে পারি। হে পরম পিতা! আমাদের এই সংসারজালে জড়িত জটিলতাপূর্ণ কর্ম্মগত জীবনে, যেন দিনান্তে একবার আকাশের দিকে চাহিয়া তোমার অনন্ত মহিমার কথা স্মরণ করিতে পারি; তুমি আমাদিগকে এই অবসর প্রদান কর। হে দয়াময়! আমরা যেন অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ কালের আশ্রয় ও কালাতীতরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তোমার বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিয়া তোমার দিকে চাহিতে চাহিতে এই ভবের খেলা সাঙ্গ করিতে পারি। তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। হে চিরনূতন! সংসারের সকল বস্তুই পুরাতন হয়, কিন্তু তোমার এই অনন্তভাবময়রূপ কখনই পুরাতন হয় না। তোমার এই অনন্তভাবের অভিব্যক্তি দ্বারা আমাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনে নূতনত্বের আদর্শ সর্ব্বদাই অঙ্কিত করিতেছ, এইজন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি। হে অনাদি মহিমাময়! তোমার প্রকাশময় ভাব নিত্য নূতন হইলেও তুমি যে কত পুরাতন, তোমার যে আরম্ভ কোথায়, ইহা অনুসন্ধান করিতে গেলে আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, কল্পনা, চিন্তা ও বিচারশক্তি পরাস্ত হয়। অতএব তোমারই করুণাবলে আমরা নির্ণয় করিলাম যে, তুমি নূতন পুরাতনের

অতীতরূপে অনাদি অনন্তভাবে অবিকৃত অবস্থায় থাকিয়া তোমার অপার মহিমা ব্যক্ত করিতেছ। তোমাকে নমস্কার।

স্বরূপতত্ত্ব।

অবিভাজ্যং অদ্বয়ং—তাঁহাকে ভাগ করা যায় না এবং তাঁহার আর দ্বিতীয় নাই। আমরা ব্যবহারিক ভাবে যে এককে এক বলি, উহাকে দুই দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল হয় ($\frac{১}{২}$) অর্থাৎ অর্দ্ধ। কিন্তু সেই এক এত সূক্ষ্মাতিতম সূক্ষ্ম যে, তাঁহার ভাগ হইতে পারে না। পরিমাণ না থাকিলে তাহার অংশ হইতে পারে না। আবার পরিমাণ থাকিলে, তাহাকে সূক্ষ্মতম বলা যায় না। সুতরাং তিনি পরিমাণশূন্য সূক্ষ্মতম বলিয়া অবিভাজ্য। আবার তিনি অতিশয় বৃহত্তম এজন্যও অবিভাজ্য। তিনি এত বৃহৎ যে, আমাদের জ্ঞান, কল্পনা চিন্তাদ্বারা আমরা যত বৃহৎকে বুদ্ধিদ্বারা আয়ত্ত করিতে পারি, সে সমুদয়ই সেই বৃহত্তমের অন্তর্গত। সেই বৃহত্তের অন্ত নাই। তাহা অসীম। সুতরাং যাহার সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না, তাহা ভাগ হয় কিরূপে? মনে কর, একটী বৃত্তকে একটী সরল রেখাদ্বারা দুই ভাগ করিতে গেলে, উহার পরিধির একদিক হইতে অপর দিক ঐ রেখাদ্বারা স্পর্শ করিতে হইবে। কিন্তু যে বৃত্তের পরিধি নাই, তাহাকে ভাগ করা যায় না। সুতরাং সেই পরিধিশূন্য অনন্তস্বরূপ অবিভাজ্য।

তিনি অনন্ত অখণ্ডরূপে এক, তাঁহার আর দ্বিতীয় তৃতীয় হইতে পারে না। সেই অনন্তের ব্যষ্টিরূপে প্রকাশময় বহুত্বের সমষ্টিস্বরূপ যে বড় এক, তাহার দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি সংখ্যা-

সূচক শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না ; কারণ, সংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হউক, সমুদয়ই বহু বা বড় এক, অথবা বৃহত্তমের অন্তর্গত। অতএব অখণ্ড যাহা, তাহার দ্বিতীয়ের আশ্রয় কোথায়? এইজন্য তিনি অদ্বয়ং অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ং। এই এক ও বহু এই দুইটী সংখ্যা নির্দ্দেশক বস্তু ; তিনি ইহার অতীত। ইহা তাঁহারই অনন্ত স্বরূপের অন্তর্গত। এক ও বহু এই দুইটী বিপরীত ভাবাপন্ন সংখ্যাসূচক শব্দ পরস্পর আপেক্ষিক। ইহার একটীকে ছাড়িয়া আর একটীর কোন অর্থ থাকে না। সুতরাং ইহা সেই একটী বস্তুর দুইটী দিক্। এক অর্থে, সূক্ষ্মতম এক ও বৃহত্তম এক এই দুই একই হইতে পারে। বহু অর্থে অনেক একের সমষ্টি বড এক। সুতরাং এই বড় এক ও এক ; ছোট এক ও এক। সবই সেই একের এক। যিনি এক, তিনিই বহু। যিনি ব্যষ্টিরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমান অনেক এক, তিনিই সমষ্টিরূপে অখণ্ড অনন্তরূপে বহু বা বড় এক। অতএব সমুদয়ই সেই একের অন্তর্গত। সুতরাং এই প্রকাশমান বাহ্যজগতের নানাত্ব, বহুত্বরূপ আপেক্ষিক ভেদ যাহা, তাহা অভেদেরই প্রমাণ করিয়া একত্বে লইয়া যায়।

এতদ্দ্বারা দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে। প্রাচীন দার্শনিকদিগের মধ্যে যাঁহারা একের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা ঐ একের সহিত বহুত্বের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া কল্পিত মায়াবাদের সৃষ্টি করিয়া মায়াময় মিথ্যা সংসার ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাসী সাজিয়া নির্জ্জনে বনে যাইয়া সেই একের সাধনায় মানব জীবনকে আহুতি প্রদান করিলেন। আর যাঁহারা বহুত্বরূপ অকুল সমুদ্রে পতিত হইয়া কিনারা স্পর্শ করিতে

পারিলেন না, তাঁহারা দিশাহারা হইয়া ক্রমান্বয়ে তেত্রিশ কোটী দেবতার সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের উপাসনায় রত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া পুনরায় অতি কষ্টে একেকে ধরিয়া একেশ্বরবাদে উপনীত হইলেন। কিন্তু একেশ্বর-বাদে উপনীত হইয়াও অনন্তকে সম্যক্‌রূপে ধরিতে পারিলেন না। কাজেই, মানব স্বভাব-সুলভ বুদ্ধিযোগে সেই ঈশ্বরকে চারি অংশ তিন অংশ, দুই অংশ ইত্যাদিরূপে বিভাগ কল্পনা করিতে লাগিলেন। এই সমুদয় কল্পিত বিভাজ্যতাবাদ, মধ্যবর্ত্তীবাদ, প্রতিনিধিবাদ অদ্যাপি এদেশে আদৃত হইয়া আসিতেছে। আসিতেছে এইজন্য ; একেশ্বরবাদ, অদ্যাপি অনেক স্থলে অভ্রান্ত-ভাবে নিশ্চিতরূপে গৃহীত হইতে পারে নাই। তিনি যে সম্পূর্ণ-রূপে অবিভাজ্য, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম, এক ও বহুর অতীত, এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তম, অখণ্ড, অনন্ত ; এই তত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে সর্ব্বত্র গৃহীত হয় নাই। আবার কোন কোন দার্শনিক সম্প্রদায় এক ও বহুর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া, এই দুইটীকেই বাদ দিয়া শূন্যবাদে উপস্থিত হইয়া এই মীমাংসা করিলেন যে, এ সংসারে মানবের কর্ম্মই প্রধান। মানব স্বীয় কর্ম্মদোষে দুঃখ পায়। এই কর্ম্মফল ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না। মানব যতই কেন ভজন সাধন ও ঈশ্বরোপাসনা করুক, ভোগ ব্যতীত কর্ম্মফল কিছুতেই ক্ষয় হইবে না। সুতরাং স্বকৃত কর্ম্ম যাহা, তাহা ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিয়া, ভাবী দুঃখ নিবারণের জন্য সর্ব্ব প্রকার বাসনা কামনা ত্যাগ করিতে হইবে ; কিন্তু এরূপ কর্ম্মাধীন দুর্ব্বল ঈশ্বরকে লইয়া মানব-বুদ্ধি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। সেই-জন্য মহাত্মা চৈতন্যদেব, মহাত্মা মহম্মদ ও মহাত্মা যীশু প্রভৃতি

দেশ বিদেশীয় ধর্ম্মের সংস্কারকর্ত্তা মহাপুরুষগণ উত্থিত হইয়া দ্বৈতা-দ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করতঃ অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে এই সংসারে বসাইয়া ভক্তি, প্রেম, ভাব ও জ্ঞান প্রধান ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যুগান্তর উপস্থিত করিলেন। যে ঈশ্বর শূন্যরূপে মানব-চক্ষের ও কর্ম্মফলের অন্তরালে অদৃশ্যরূপে, অকর্ম্মণ্যরূপে প্রতীয়মান হইতে-ছিলেন; যিনি স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে, অন্তরীক্ষে, বৃক্ষে, প্রস্তরে ও বিবিধ তীর্থস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনিই ঐ সমুদয় মহা-পুরুষগণ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া ভক্তের হৃদয়ে, অন্তর্যামী নিত্য সত্যরূপে দেখা দিলেন। সেই অদ্বিতীয় অনন্তস্বরূপ, প্রেমলীলার জন্য কোন সম্প্রদায়ে প্রেমময়রূপে, কোন সম্প্রদায়ে অনন্ত ভাবময়-রূপে, বহির্জগতে ও মানব হৃদয়ে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার অনন্ত লীলার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদয় মহাপুরুষ-গণের সাম্প্রদায়িক নিয়মের বহু প্রকার পার্থক্য থাকিলেও, তাঁহারা জগৎ-কার্য্য ও মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন যে, মানব হৃদয়ে সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অনুপ্রকাশরূপী অনন্তত্বের বীজ রহিয়াছে। সে তদ্দ্বারা সাধনবলে, অবস্থার পরিবর্ত্তন সহকারে উন্নতিলাভ করিতে পারে এবং সেই জন্যই তাঁহাদিগের দ্বারা আহুত হইয়া দলে দলে পাপী, ঘৃণিত, দস্যু, তস্কর প্রভৃতি অজ্ঞানান্ধ মানব উদ্ধার হইতে লাগিল। বাল্মীকি প্রভৃতি পুরাতন পাপিগণ ঋষিত্ব লাভ করিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, মানবাত্মায় সেই এক, অখণ্ড অনন্তের বীজ প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সাধু মহাত্মাগণ এই অনন্ত আশার আলোক লাভ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তাঁহারা বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, মানব যতই কেন পাপী, তাপী, ঘৃণিত হউক না কেন,

তাহার সম্মুখে অনন্ত উন্নতির পথ বিদ্যমান রহিয়াছে। সে অনন্ত অদ্বিতীয়কে আদর্শ করিয়া আশার আলোকে নিশ্চয়ই উন্নত জীবন লাভ করিবে।

এক্ষণে একবার প্রত্যক্ষ জগতে অনন্তের সেই অদ্বিতীয় এককে অনুসন্ধান করা যাউক। এই বহুত্বপূর্ণ প্রকাশময় জগতের যে দিকে দৃষ্টি করা যায়, সেই দিকেই অনন্ত ভাব দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ সমুদয় অনন্ত ভাবময় বিষয়কে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে বিচার দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে সেই একে যাইয়াই উপস্থিত হইতে হয়। সেই এক ভিন্ন কিছুতেই আমাদের বুদ্ধিশক্তি শান্তিলাভ করিতে পারে না।

এস্থলে একটী গল্প করিতে হইল। আমি একদিন একটী নারিকেলের মালা পিপীলিকাপূর্ণ দেখিয়া, উহাতে কতসংখ্যক পিপীলিকা আছে, তাহা দেখিবার জন্য একটী সূচ্যগ্রদ্বারা পৃথক পাত্রে অন্যূন ছয় ঘণ্টাকাল গণনা করিয়া দশ সহস্র পিপীলিকা গণনা করিলাম। কিন্তু শেষে মালার দিকে চাহিয়া দেখি, যাহা গণনা করা হইয়াছে, তদপেক্ষা মালায় অধিক পরিমাণে পিপীলিকা আছে। আমার অনুমান হইল, ঐ মালার সমুদয় পিপীলিকাগুলি গণিয়া শেষ করিতে তিন দিন লাগিবে। সুতরাং আমি অনর্থক ক্লেশ ভয়ে গণনায় বিরত হইয়া ভাবিলাম, এই দুই ইঞ্চি স্থানব্যাপী একটী মালার মধ্যে পিপীলিকার সংখ্যা এই; আর এই প্রকাণ্ড পৃথিবীতে কোথায় কত মালায় বা অন্য আশ্রয়ে কত পিপীলিকা আছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে; তখন আমি উহার স্বজাতীয় ভেদ পরিত্যাগ করিয়া একে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য ধরিয়া লইলাম যে, মালায় পিপীলিকা হইয়াছে। সবই এক

পিপীলিকা। উহার সংখ্যার আমার আবশ্যক কি? এবং কেই বা উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারে। একটী গাছের পাতা গণনা করিতে হইলে মানবের গণিত বিজ্ঞান পরাস্ত হয়, আর এমন কোথায় কত গাছের পাতা আছে, তাহার সংখ্যা কে নির্ণয় করিবে? তবে যাঁহার এই জগৎ, তিনি সমুদয় গণনা করিতে পারেন; তাঁহার গণিতশাস্ত্র, আমাদের ক্ষুদ্র গণিতশাস্ত্র অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। অতএব এই যে বিষয় জগতের নানাত্ব বহুত্ব আমাদের অনুভূত হইতেছে, ইহার মূলে সেই এক রহিয়াছেন। এক না থাকিলে বহু উৎপন্ন হইতে পারে না। অনেক একের সমষ্টি বহু বা বড় এক। পৃথিবীস্থ পরিজ্ঞাত ভূভাগের মনুষ্য সংখ্যা আমরা প্রায় গণনা করিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু কোথায় কত অপরিজ্ঞাত ভূভাগে কত মনুষ্য আছে, তাহা কে বলিতে পারে? অতএব ধরিয়া লইতে হইবে, সবই এক মানুষ। এক প্রকার অস্থি, রক্ত, মাংসে গঠিত ও এক স্বভাবাপন্ন। কেবল ইহার প্রকাশেই নানাত্ব। মূলে কিন্তু এক মানুষ। এইরূপ পশু-পক্ষী ইত্যাদি জীবসমূহের স্বগত ও স্বজাতীয় ভেদ পরিত্যাগ করিয়া এক প্রাণিজগতে আসিতে হইবে। তৎপরে প্রাণিজগৎ হইতে "ক্ষিত্যপতেজোমরুৎব্যোম" এই পঞ্চভূত বিয়োগ করিলে একমাত্র তিনিই অবশিষ্ট থাকিবেন। এক্ষণে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এই দৃশ্যমান ও নিরাকার জগৎ যন্ত্র সেই এক যন্ত্রীরই লীলাভূমি। অতি সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক কীটাণু হইতে বৃহৎকায় হস্তী গণ্ডারাদি জীবসমূহ; সূক্ষ্ম পুষ্পরেণু হইতে বিশাল বটবৃক্ষাদি উদ্ভিদসমূহ ও সূক্ষ্ম ধূলিকণা হইতে প্রকাণ্ড পাহাড় পর্ব্বতরূপ জড়জগৎ; সকলেই পরস্পর আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়রূপে

কার্য্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, সেই অনন্ত অখণ্ড একের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া তাঁহার বিচিত্র লীলার সহায়তা করতঃ তাঁহার অপার মহিমা ব্যক্ত করিতেছে। আমাদের সসীম মানবীয় ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই জগতে আমরা নিয়ত নানাপ্রকার বৈষম্যযুক্ত, অনাবশ্যক ও ঘৃণা-বিদ্বেষজনক বিষয় দেখিতে পাই। কিন্তু পাঠক! এই ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদয় বিষয়ই সেই একের অনু-মোদিত,, ইপ্সিত ও প্রয়োজনীয়। একমেবাদ্বিতীয়ং।

প্রার্থনা।

হে অনন্ত অখণ্ড এক! তোমাকে নমস্কার। তুমি আমাদের এই বহুত্বপূর্ণ ভ্রান্তিময় জগৎ হইতে তোমার অদ্বিতীয় একত্বের দিকে লইয়া যাও। আমরা যেন বিষয় জগতের প্রত্যেক বস্তুতে তোমার একত্বের পরিচয় পাইয়া তোমার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক, তোমারই আদেশ পালন করিতে পারি। হে অনাদি মহিমাময়! তুমিই হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের এক ঈশ্বর। সকলেই নিজ নিজ ভাষা দ্বারা তোমার বিবিধ পবিত্র নাম রাখিয়াছেন। কিন্তু তোমার কোন জাতি ও সম্প্রদায়গত পক্ষপাতিত্ব নাই। তুমি সকল ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের উপাস্য দেবতারূপে পূজিত হইয়া আসিতেছ। প্রকৃত পক্ষে তুমি উপাধি শূন্য; তথাপি তুমি যে করুণা করিয়া আমাদিগকে বাক্‌শক্তি প্রদান করিয়াছ, তদ্দ্বারা তোমার উৎকৃষ্ট নাম কল্পনা-পূর্ব্বক তাহা কীর্ত্তন করিয়া তোমার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। অতএব হে প্রভু! আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন স্ব স্ব ভাষাগত কল্পিত নাম উচ্চারণ

করিতে করিতে তোমার প্রকৃত সত্ত্বা উপলব্ধি করতঃ তোমাকেই প্রাপ্ত হই। আমরা যেন নানাত্ব বহুত্বের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া তোমাকে না হারাই।

স্বরূপতত্ত্ব।

নিরাকারং বিশ্বরূপং—তিনি আকারশূন্য অর্থাৎ আমাদের এই চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। অথবা অন্য কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারাও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। বিশুদ্ধ জ্ঞান দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই হিন্দু শাস্ত্রকারেরা পবিত্রাচারী শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণ স্বভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য আচমনীয় মন্ত্র প্রস্তুত করিলেন; "তদ্বিষ্ণো পরং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়; দিবীব চক্ষুরাততম্"। ইহার অর্থ, চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থকে সুস্পষ্টরূপে দর্শন করে, সেইরূপ জ্ঞানী মনুষ্যেরা সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার পরম পদকে দর্শন করিয়া থাকেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, সাধারণ লোকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিলে, তৎপ্রতি তাহাদের যেরূপ নিঃসন্দেহ বিশ্বাস জন্মে, সেইরূপ নিরাকার ঈশ্বরকে জ্ঞানযোগে দর্শন করিয়া জ্ঞানিগণের নিঃসন্দেহ বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। কিন্তু অমার্জ্জিত বিবেক, অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি তাঁহাকে জানিতে পারে না। সেই জন্য হিন্দু শাস্ত্রকারেরা স্ত্রী, শূদ্র, বালক প্রভৃতি দুর্ব্বলাধিকারীদিগের জন্য সাকার উপাসনামূলক বিবিধ মূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা করিলেন। এক্ষণে দেখা যাউক, তাঁহাদের এই ব্যবস্থা কতদূর বিধিসঙ্গত ও উপকারজনক।

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, মানবাত্মা স্ব স্ব ব্যক্তিগতভাবে যে স্বাধীন, পরিবর্ত্তনশীল ও উন্নতিশীল, সে ব্যক্তিগতভাবে সাধন ও

চেষ্টা দ্বারা উন্নত অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে, এ বিশ্বাসটা বোধ হয় প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের তখন জন্মে নাই। তাঁহারা ভাবিতেন, শূদ্র মানব হইলেও পশুর ন্যায় স্বাভাবিক সংস্কারাপন্ন একটা ভিন্ন প্রকৃতির জীব। তাহারা বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আছে, চিরকালই সেই অবস্থায় থাকিবে; আর স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ স্বল্পবুদ্ধিশালিনী ও সুকোমলমতি; এবং বালকগণ অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন; সুতরাং ইহারা নিরাকার নিরয়বয়ব পরমাত্মার ধারণা করিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক উপাসনা করিতে পারিবে না। অতএব তাহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থমূলক ঈশ্বরারাধনার জন্য একটা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করাই যুক্তিসঙ্গত, তাই পৌত্তলিকতার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু তাঁহাদের এই ব্যবস্থা যে আপত্তিজনক, তাহা জগতের ইতিহাস, বিজ্ঞান ও মানব-প্রকৃতি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে। আধুনিক সভ্যজগতে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হইয়া এবং তাঁহাদিগের বিদ্যালাভে পারদর্শিতা ও নিপুণতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে আর স্বল্পবুদ্ধিশালিনী বলিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। তাঁহাদের উৎকৃষ্ট বুদ্ধিশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং তাঁহারা নিরাকার স্বরূপের আধ্যাত্মিক উপাসনার অধিকারিণী নহেন, একথা কোন ক্রমেই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এ ব্যবস্থা তাঁহাদের প্রতি অযথারূপে প্রয়োগে দণ্ডস্বরূপ হইয়াছে।

তৎপরে শূদ্রের কথা। শাস্ত্রকারেরা যে শূদ্রের জন্য মূর্ত্তিপূজা, স্মৃতিশাস্ত্র ও মনুসংহিতাদিতে দীর্ঘকাল অশৌচাদি গ্রহণ ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার অজুহাতে কঠোর দণ্ড ও নির্য্যাতনের ব্যবস্থা করিয়াছেন; সে শূদ্র, অতি নিম্ন-

শ্রেণীর অজ্ঞান ও নিকৃষ্ট প্রকৃতির মানবকে বুঝায়। তাহারা সেই অবস্থায় দুর্ব্বলাধিকারী বটে। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের সেই অবস্থা পশুদিগের প্রকৃতির ন্যায় অপরিবর্ত্তনীয় বদ্ধমূল সংস্কারাপন্ন নহে। সে যখন মানব, তখন স্বীয় অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া অর্থাৎ তাহার শূদ্রত্ব বর্জ্জন করিয়া উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারে। দস্যু তস্কররূপী জগাই মাধাই ও বাল্মিকী, বিশ্বামিত্রের উন্নত অবস্থা প্রাপ্তি ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সেই জন্যই বলিয়াছি যে, তাঁহারা মানব-প্রকৃতির উন্নতিশীলতার প্রতি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই; ভাবিয়াছিলেন যে, শূদ্র বা শূদ্রকুলোৎপন্ন যে, সে চিরকালই অপরিবর্ত্তনীয়রূপে শূদ্র থাকিবে, তাহার উন্নতি লাভ হইবে না; অর্থাৎ আজ যে শূদ্র আছে, সে সাধনবলে অতি উৎকৃষ্ট আদর্শ চরিত্র লাভ করিলেও সে ব্রাহ্মণ পদে উন্নীত হইতে পারিবে না। তাহাকে ঐ শূদ্রশ্রেণীভুক্ত থাকিতে হইবে, কারণ তাহার চরিত্রের পরিবর্ত্তন হইলেও তাহার রক্তমাংসের সমষ্টিস্বরূপ স্থূলদেহের পরিবর্ত্তন হইল না। এই জন্যই তাহারা আধ্যাত্মিক উপাসনায় বঞ্চিত হইল। কেবল আধ্যাত্মিক উপাসনায় বঞ্চিত হইয়া তাহারা নিস্তার পায় নাই; তাহাদের প্রতি পক্ষপাতমূলক অপমান, নির্য্যাতন ও অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা শাস্ত্র দ্বারা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে।

এতদ্দ্বারা অনুমান করা যায় যে, ভারতের আদিমনিবাসী অসভ্য মনুষ্যদিগের সহিত আর্য্যদিগের ভয়ানক বিবাদ ছিল। আদিম নিবাসীরা আর্য্যদিগের প্রতি প্রভূত অত্যাচার করিত। এরূপ প্রমাণ পৌরাণিক বৃত্তান্তে যথেষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ অত্যাচারী দস্যু তস্করদিগের মধ্যে যাহারা ছলে, বলে,

কৌশলে তাঁহাদের বশীভূত হইত, তাহাদিগকে শূদ্রশ্রেণীভুক্ত করিয়া লওয়া হইত। এই কারণেই সেই অপরাধী ও অবিশ্বাসী শূদ্রদিগের প্রতি শাস্ত্রীয় কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন ব্যক্তিকে শূদ্রত্বের ছাপ দিয়া চিরকাল শূদ্র করিয়া রাখা যায় না। পরিবর্ত্তন ও উন্নতিশীল জগৎ দেখাইয়া দিতেছে যে, মানবাত্মা পশুর ন্যায় এক স্থানে দণ্ডায়মান থাকে না। অদ্য যে শূদ্র আছে, কল্য সে সাধনবলে উৎকৃষ্ট চরিত্র লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারে এবং অদ্য যে ব্রাহ্মণ আছে, কল্য সে নিকৃষ্ট চরিত্র লাভ করিয়া শূদ্র হইতে পারে। ইহাই হইল শূদ্রের অবস্থাগত অস্থায়ী ভাবাপন্ন লক্ষণ; সুতরাং তাহাদিগের জন্য সঙ্কীর্ণতামূলক উপাসনার ব্যবস্থা অবৈধ।

এক্ষণে বালকের কথা। সম্প্রতি যে বালক আছে, কিছু-কাল পরে সে যুবক হইবে; আরও কিছুকাল পরে সে প্রৌঢ় হইবে। তাহার এই বয়সের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে বিবিধ উপাসনা প্রণালীর ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইহা অসঙ্গত। তাহার সেই বাল্যাবস্থার অনুশীলনীয় ক্ষীণ ও সঙ্কীর্ণতামূলক উপাসনার আদর্শ বদ্ধমূল হইয়া গেলে, তাহাই পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতে তাহার যৌবনাবস্থা অতীত হইবে; সুতরাং সে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার সময় পাইতেছে কৈ? আবার যাঁহারা ঐ পৌত্তলিক উপাসনার পদ্ধতি প্রচার করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রকারেরাই বলিয়াছেন, পৌত্তলিক উপাসনা নিম্ন অধিকারীর জন্য, উহা নিকৃষ্ট উপাসনা। অতএব যাহা নিকৃষ্ট, তাহা কখনই গ্রহণীয়রূপে আদর্শস্থানীয় হইতে পারে না। আবার মানবকুলের মধ্যে "নিম্ন অধিকারী" উপাধিধারী,

হতভাগ্য যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি, ইহাও বাছিয়া লওয়া বড় শক্ত কথা। অতএব মানবমাত্রেরই নিরাকারকে আদর্শ করিয়া তাঁহারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। যিনি নিরাকার, তিনিই দৃশ্যমান জগতের সাকার বস্তুসমূহের নিয়ন্তা, আশ্রয় ও পরিচালক। এই সগুণ সাকার জগৎ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই লীন হইতেছে। তিনি নিরাকার নির্গুণরূপে পদ্মপত্রস্থিত বারির ন্যায় নির্লিপ্তভাবে সগুণ সাকারের আশ্রয় হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনিই উপাদান কারণরূপে সাকার গুণময় জগৎ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর পৃথক সত্ত্বা নাই। সুতরাং সমষ্টিভাবে জগৎরূপেও তিনি। এই অর্থে তিনি বিশ্বরূপ। ইহা তাঁহার প্রকাশময় স্বরূপ। কিন্তু সেই নির্গুণ অব্যক্ত স্বরূপ হইতে সগুণ প্রকাশময় স্বরূপ পৃথক করা যায় না। সুতরাং যিনি নির্গুণ তিনিই সগুণ। যিনি নিরাকার তিনিই সাকার। ঊর্ণনাভের সূত্রোৎপত্তির ন্যায়, সমুদ্রোত্থিত জলবুদ্‌বুদের ন্যায়, এই বিশ্ব তাঁহাতেই উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই লীন হইতেছে। তিনিই ইহার কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, আধার ও উপকরণ। কোন বস্তু হইতে তাঁহাকে পৃথক করা যায় না। বায়ুসাগরে পক্ষিগণ, জলাশয়ে মৎস্যগণ যেরূপ সন্তরণ করে, সেইরূপ জীবাত্মাসমূহ এই বিশ্বাত্মারূপ মহাসমুদ্রে সন্তরণ করিতেছে। এই বিশ্ব হইতে তাঁহাকে পৃথক কল্পনা করা যায় না। তিনি বিশ্বরূপী বিষয়ী; এই বিশ্ব তাঁহার বিষয়। বিষয়ীকে বাদ দিয়া বিষয়ের কোন অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং তিনিই বিষয় জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার বিষয়িত্বের পরিচয় দিতেছেন। তিনি প্রাণময়রূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া সকল জীবের

জীবত্ব সম্ভব করিতেছেন। তিনিই জড়রূপে উপাদান কারণ হইয়া জগৎ কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন। তিনিই আকাশ-রূপে ব্যাপ্ত হইয়া জগতের আশ্রয় হইয়াছেন। তিনিই জলবায়ু খাদ্যরূপে সকল জীবের জীবন রক্ষা করিতেছেন। তিনিই ভক্তিভাজন পিতৃরূপে আমাদের জন্মদানপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতেছেন। তিনিই প্রেমময়ী মাতৃরূপে গর্ভে ধারণ করিয়া-ছিলেন এবং স্তন্যরূপ অমৃতদানে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনিই মাতৃহৃদয়ে অজস্র প্রেমধারা বিতরণ করিয়া আমাদের অসহায় শৈশব জীবন রক্ষা করিয়া আমাদিগকে প্রেম শিক্ষা দিতেছেন। তিনিই প্রেমময়ী প্রণয়িনীরূপ ধারণ করিয়া আমাদের প্রণয় পিপাসা নিবৃত্তি করিতেছেন। তিনিই গৃহের গৃহিণী হইয়া গৃহের শোভা-সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনপূর্ব্বক সংসারকে উজ্জ্বল করিতেছেন। তিনিই ভ্রাতৃরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের মঙ্গল কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। তিনিই পুত্রকন্যারূপে আসিয়া আমাদের অপত্য স্নেহ গ্রহণ করিতেছেন। তিনিই গরীব, দুঃখী, কাঙ্গাল সাজিয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক আমাদিগের উপচিকীর্ষাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন। তিনিই শত্রু ও দ্বেষ্য-রূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদের অন্তর্নিহিত নিদ্রিত শক্তিকে জাগাইয়া কর্ম্মে উৎসাহ ও অধ্যবসায় দানে উন্নতির সহায়তা করিতেছেন। তিনিই চোর, দস্যুরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সাবধানতা বৃত্তি জাগাইয়া দিয়া সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় হইতেছেন। তিনিই গুরু, শিক্ষক ও শাস্ত্ররূপে জ্ঞানালোক প্রদান করিয়া আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতেছেন। তিনিই ন্যায়ের অবতাররূপে আমাদের অন্তরে ন্যায়পরতা বৃত্তি প্রদান

করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। এই জগৎ তাঁহারই প্রকাশ, এই অর্থে তিনি বিশ্বরূপ। এই বিশ্বরূপ সংসারই আমাদের প্রকৃত সাধন ক্ষেত্র। আমরা এই বিশ্বে উৎপন্ন হইয়া ইহাতেই প্রতিপালিত ও রক্ষিত হইতেছি, আবার ইহাতেই লীন হইব। সুতরাং ইহা ভিন্ন আমাদের আর স্থান নাই। তিনি নিজে নিরাকার হইয়াও সাকার বিশ্বরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতেছেন। অতএব সাকারের মধ্য দিয়াই নিরাকারকে দেখিয়া, শুনিয়া, জানিয়া, চিনিয়া, তাঁহার আদেশ পালনরূপ কর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। সাকারের মধ্যে যিনি নিরাকারকে দেখেন, সগুণের মধ্য দিয়া যিনি নির্গুণকে দেখিতে পান, তাঁহারই প্রকৃত ঈশ্বর দর্শন লাভ হয়।

নিরাকার কথাটা মনে হইলে আমাদের অকস্মাৎ আকাশের কথা মনে পড়ে। কিন্তু যে অর্থে, যে ভাবে ঈশ্বর নিরাকার; আকাশের সহিত তাঁহার উপমা দেওয়া যাইতে পারে না। আকাশ হইতেছে জড়জগতের আশ্রয়রূপী অবকাশ বা ফাঁক। আর ঈশ্বর ঐ আকাশাশ্রিত জগতের আশ্রয় অর্থাৎ তিনি আকাশেরও আশ্রয় এবং জগতেরও আশ্রয়। তিনি জীবন্ত, স্বপ্রকাশ, সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বরূপ। এই নামরূপময় বিশ্বের যে বস্তু আমাদের নিকট যে ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার সহিত আমাদের সেই প্রকার কর্ত্তব্য নিরূপণপূর্ব্বক উপযুক্ত ব্যবহার করিতে হইবে। ইহাই নিরাকার বিশ্বরূপের কর্ম্মমূলক সাধনা।

প্রার্থনা।

হে বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বের পরিচালক, বিশ্বরূপী নিরাকার! তুমি এই প্রকাশময় বিশ্বেই তোমার নিরাকার স্বরূপ অনুভব

করিবার শক্তি আমাদিগকে প্রদান কর। হে পরম পিতা! সমুদয় বিশ্বেই তোমার চৈতন্যের অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইতেছে। তুমি জ্ঞানময়, ইচ্ছাময়, প্রেমময়রূপে সর্ব্বত্রই তোমার মহিমা ব্যক্ত করিতেছ। আকাশের বিচিত্র বর্ণ তোমার প্রেমের সৌন্দর্য্যের বিকাশ, প্রভাতকালীন সূর্য্যকিরণ তোমার প্রেম মুখের হাসি, বিহঙ্গের কাকলী, শিশুর সঙ্গীত তোমারই প্রেম কণ্ঠের সুমধুর ধ্বনি, মৃদুমন্দ সমীরণ তোমারই সুকোমল স্পর্শ প্রদান করে। তুমি নিজে নিরাকার হইয়া সাকারের মধ্য দিয়া আমাদিগকে দেখা দিতেছ। এইজন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

হে পরম পিতা! আমরা যখন যেখানে যে ভাবেই থাকি, সর্ব্বদা যেন তোমাকে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারি, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। আমরা যেন তোমাকে পরিমিত ক্ষুদ্র সাকার প্রতিমায় আরোপ করিয়া তোমার নিরাকার অনন্ত স্বরূপের অবমাননা না করি, তুমি আমাদের এইরূপ জ্ঞানালোক প্রদান কর।

স্বরূপতত্ত্ব।

নিরপেক্ষং—স্বাধানং—তিনি কাহারও অপেক্ষা রাখেন না বা অপেক্ষা করেন না। তাঁহার বিদ্যমানতার বা তাঁহার অস্তিত্বের জন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির আপেক্ষিকতার আবশ্যক হয় না। তিনি অনন্ত জ্ঞানময় ও সর্ব্বশক্তিমান্; তিনি সকলের আধার নিয়ামক ও পরিচালক হইয়া স্বপ্রকাশরূপে আপনার মহিমাতে আপনি বিরাজিত। বিষয় জগৎ তাঁহারই আপেক্ষিকতায় পরিচালিত, কিন্তু তিনি নিজে নিরপেক্ষ। তাঁহার কোন বিষয়ে

কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব নাই। তিনি সকলের পক্ষেই সমান। এই জন্য তিনি ন্যায়বান্। ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, জ্ঞানী, অজ্ঞান, তিনি সকলের পক্ষেই সর্ব্বাবস্থায় সমান। তাঁহার কেহ শত্রু মিত্র দ্বেষ্য সম্মত নাই। তিনি বিড়াল ও ইন্দুর, ব্যাঘ্র ও হরিণ এই দুই পক্ষকেই প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। সাধু মহাত্মারও তিনি ঈশ্বর, ঘৃণিত পাপীরও তিনি ঈশ্বর, সকলের প্রতি তাঁহার সমান দয়া। তবে যে মানুষ সংসারের তাড়নায় রোগ, শোক, দুঃখ, যন্ত্রণায় নির্য্যাতিত হইতেছে, সে কেবল তাহার স্বভাবগত অজ্ঞানতামূলক অকর্ত্তব্য ব্যবহারের ফলে। তিনি সাধু ও পাপী দুইজনকেই সমান ভালবাসেন, সাধুকে ভালবাসেন তাঁহার ঐশ্বর্য্য দিয়া এবং পাপীকে ভালবাসেন দুঃখ যন্ত্রণা দিয়া। পিতা মাতা যেমন দুর্দ্দান্ত বালককে শিক্ষাদান ও সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষক নিযুক্ত করেন, শিক্ষক সেই দুর্দ্দান্ত বালককে বিবিধ শাস্তি প্রদান করিয়া ও শিক্ষালয়রূপ কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাকে সৎপথে আনয়নপূর্ব্বক পিতা মাতাকে সন্তুষ্ট করেন; ঈশ্বরও ঠিক ঐরূপ তাঁহার দুর্দ্দান্ত সন্তানগণকে সৎপথে আনিবার জন্য নানাবিধ দুঃখ যন্ত্রণার মধ্য হইতে শিক্ষা দিয়া ভালবাসেন। সুতরাং কোন স্থলে কোন অবস্থায় তাঁহার পক্ষপাতিত্ব নাই। পৌরাণিক গল্পে তাঁহার নিরপেক্ষ স্বাধীনতার বাধাজনক দুই একটী কাহিনী পাওয়া যায়; যেমন বৈষ্ণবেরা বলেন, "ভক্তভীত গোবিন্দ" ইহার অর্থ এই যে, গোবিন্দ ভক্তকে ভয় করেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, ভক্ত একটা অন্যায় কার্য্য করিলেও গোবিন্দ তাহাকে ভয় করেন বলিয়া কোন শাস্তি প্রদান করেন না।

এরূপ গল্প ভক্তিসাধনের উৎকর্ষতা দেখাইবার জন্য, অতিশয়োক্তি অলঙ্কার মাত্র। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত যিনি, তিনি আমিত্ব-মূলক সমুদয় সম্পদ ঈশ্বরকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার চির দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং সেই ভক্ত গোবিন্দের ভয়ের কারণ হইবেন, কিরূপে? একথা বুঝাইবার উদ্দেশ্য এই যে, দুই একটী তরলমতি সাধকের এরূপ ধারণা জন্মিতে পারে যে, আমি যখন ঈশ্বরকে সেবা-ভক্তি, পূজা-অর্চ্চনা, স্তুতি-মিনতি দ্বারা যথেষ্টরূপ সন্তুষ্ট করিয়া আসিতেছি, তখন ফাঁকের ঘরে দৈব উপস্থিত দুই একটা পাপকর্ম্ম করিয়া ফেলিলেও তিনি কিছু বলিবেন না; ক্ষমা করিয়া লইবেন। কিন্তু পাঠক, এরূপ বিনিময় তাঁহার কাছে চলে না। আর একটী গল্প আছে, "ব্রাহ্মণ জাতীয় ভৃগুমুনি নামক কোন ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে লাথি মারিয়াছিলেন; এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে ভৃগুপদ চিহ্ন দেখা যায়। কথাটা শুনিয়া গা শিহরিয়া উঠে; কারণ প্রাচীনকালীন ব্রাহ্মণগণ এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে লাথি মারিলেও তিনি সেই পদাঘাত বিনা আপত্তিতে সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা রচিত হইবার আর একটী বিশেষ কারণ আছে। কারণ এই যে, প্রাচীনকালে যখন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ চলিতেছিল, সেই সময়ে ব্রাহ্মণদিগের বৈষ্ণব বিদ্বেষের ফলে ইহা রচিত হইয়াছে। বৈষ্ণবদিগের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে ব্রাহ্মণের পদাঘাত, ইহাতে ব্রাহ্মণেরা আপনাদের জ্ঞানপ্রধান বৈদান্তিক ধর্ম্ম প্রবল করিবার জন্য ভাব-প্রধান বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে আধুনিক পণ্ডিতেরা ঐ আখ্যায়িকার

আর এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করেন; যথা, জ্ঞানপ্রধান ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ জাতি, জ্ঞানবলে সাধন দ্বারায়, আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। সুতরাং পদাঘাতটা পদার্পণে পরিণত হইয়া সামঞ্জস্য রক্ষিত হইল। সুতরাং ইহা জ্ঞানপ্রধান ধর্ম্মের উৎকর্ষতামূলক অতিশয়োক্তি অলঙ্কার যোগে রচিত কথা মাত্র। ইহাতে ঈশ্বরের স্বাধীনতার কোন বাধা হইতেছে না। তিনি কাহারও অধীন নহেন, সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই স্বাধীনতা তাঁহার প্রিয় সন্তান জীবসমূহকে কিছু কিছু দিয়াছেন। কিন্তু তন্মধ্যে তাঁহার অনুপ্রকাশরূপী মানবাত্মায় যে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহার বিশেষত্ব আছে। বিশেষত্ব এই যে, সে এই স্বাধীনতার উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনপূর্ব্বক মনুষ্যত্বের চরমসীমায় উপস্থিত হইতে পারে। আবার এই স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট অবস্থা লাভ করিয়া অবনতির শেষ সীমায় উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং মানবকে যে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপ দায়িত্বপূর্ণ। এই স্বাধীনতাকে সেই নিরপেক্ষ স্বাধীনের স্বাধীনতার অন্তর্গত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে আত্মরক্ষা করা হয়। আর তাঁহার স্বাধীনতার প্রকাশ স্বরূপ ন্যায়পরতার সীমা অতিক্রম করিলেই মানবাত্মা অধোগামী হয়। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াও ন্যায়ের অবতার। কোন স্থলেই তাঁহার অন্যায় ব্যবহার প্রতিপাদন করা যায় না। তবে যে আমরা সসীম ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনেক স্থলে বৈষম্য ও অন্যায় অনুভব করি, তাহা কেবল বুঝিতে পারি না বলিয়া। তিনি আমাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার

জন্য ন্যায়পরতা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন; এই বৃত্তির দ্বারাই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণপূর্ব্বক আমাদের এই ক্ষুদ্র স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহার প্রিয় হইতে পারি। তিনি যে তাঁহার প্রিয় জীবগণকে, বিশেষতঃ মনুষ্যদিগকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দিয়া তাঁহার আপনার স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি জীবের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এই জন্যই আমরা বিদ্যাবুদ্ধি, শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া অনেক স্থলে অনেক সময়ে বিফল মনোরথ হই। তাঁহার অনিচ্ছায় অর্থাৎ তাঁহার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আমরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। ইহাই তাঁহার বিচিত্র জীবলীলার অদ্ভুত কৌশল ও অপার মহিমা।

প্রার্থনা।

হে নিরপেক্ষ পরম স্বাধীন মহিমাময় পরমেশ্বর! আমরা যেন সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীন হইয়া চলিতে পারি, তুমি আমাদিগকে এই সুযোগ প্রদান কর। আমদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে তোমার নিরপেক্ষমূলক ন্যায়পরতার অধীন করিয়া যেন সংসারাসক্তি ও ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি, আমাদের মনে এইরূপ বলদান কর। হে মহিমাময়! তুমি আমাদিগকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দান করিয়া সকল সুখ সম্পদের অধিকারী ও অসীম উন্নতির সোপান করিয়াছ; এক্ষণে প্রার্থনা, যেন আমরা ঐ স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া আত্মাকে কলঙ্কিত না করি। তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। হে প্রাণারাম! তোমার ন্যায়পরতার প্রতিবিম্ব সকল মানবে

অভিব্যক্ত হইয়া তোমার অপার মহিমার পরিচয় প্রদান করিতেছে। হে মহিমাময়! আমরা যেন তোমাকে আদর্শ করিয়া সকল বিষয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে পারি। আমরা যেন অকর্ত্তব্য ভাবে ন্যায়পরতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া কোন বিষয় বিশেষের পক্ষপাতী না হই। হে পরম স্বাধীন! আমরা যেন বিপদে, সম্পদে, সর্ব্বদা তোমাকেই একমাত্র হৃদয়ের আশ্রয় ও নির্ভরস্থল করিয়া লইতে পারি। সিংহের শাবক হইয়া যেন শৃগালের শরণাপন্ন হইতে না হয়। তুমি আমাদিগকে এইরূপ আত্মনির্ভর শক্তি প্রদান কর। শিশু যেমন পিতামাতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নির্ভয়ে ও নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রিত হইয়া সন্দেহ-সঙ্কুল, আশঙ্কাজনক অন্ধকারময় রাত্রিকাল অতিবাহিত করে, আমরাও যেন সেইরূপ তোমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া, তোমার প্রতি একান্ত নির্ভর স্থাপন করিয়া, নির্ভয়ে ও নির্ব্বিঘ্নে এই অন্ধকারময় ভীতিপূর্ণ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, ইহাই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

সর্ব্বজ্ঞং-চিরজাগ্রতং—তিনি সকলই জানিতেন, জানিতেছেন ও জানিবেন। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সমুদয়ই তাঁহার জ্ঞাতসারে ঘটিয়াছিল, ঘটিতেছে ও ঘটিবে। কোন অবস্থায়, কোন কালে, কোন স্থানে তাঁহার অজ্ঞাতসারে, তাঁহাকে গোপন করিয়া কিছুই হইতে পারে না। এই জগৎ সেই পরম জ্ঞাতারই জ্ঞানলীলা। সুতরাং তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে কোন বস্তু বা ঘটনা বা কোন বিষয় থাকা স্ববিরোধী ও অসম্ভব। ইহা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা পদে পদেই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতায়

অবিশ্বাস করিয়া থাকি। আমরা জগতের সহিত যে ব্যবহার করি, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়; তাঁহার বর্ত্তমানতায় আমরা অত্যন্ত অবিশ্বাসী। হিংসা, দ্বেষ, শঠতা, বঞ্চনা, চৌর্য্য, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি, আমাদের এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, ঐ সমুদয় বৃত্তি পরিচালন সময়ে আমাদের ঈশ্বরের কথা আদৌ স্মরণ থাকে না। তখন আমরা আসক্তি, প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া একেবারে মোহান্ধ হইয়া পড়ি। আবার দুই পাঁচটী বন্ধুবান্ধবসহ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তাঁহার অবিচ্ছিন্ন বিদ্যমানতার কেমন সুন্দর ব্যাখ্যা করি। ইহাই হইতেছে আমাদিগের অভ্যাসগত মহাভ্রম। এই ভ্রমে অন্ধ হইয়া আমরা নানাপ্রকার দুর্গতি ভোগপূর্ব্বক অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের বিদ্যমানতায় বিশ্বাস, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের পাপ হওয়া অসম্ভব। তিনি সর্ব্বদা জাগরিত থাকিয়া সকল বিষয়ই জানিতেছেন, সেই অশরীরী পরমাত্মার পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি নাই, বিশ্রামেরও আবশ্যক নাই, সুতরাং তাঁহার নিদ্রাও নাই; তিনি জীবগণের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তিনিবারক দৈনন্দিন নিদ্রা জাগরণের অতীত, চিরজাগ্রতরূপে বিরাজিত আছেন। কোন স্থানে, কোন কালে, কোন কারণে, সেই জ্ঞাতার জ্ঞাত হইবার কোন অন্তরাল বা বাধাজনক কিছুই নাই, এই জন্যই তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও চিরজাগ্রত।

প্রার্থনা।

হে চিরজাগ্রত মহিমাময় সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর! তোমার জাগ্রতাবস্থার কথাটা যেন আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ থাকে,

আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার সর্ব্বজ্ঞতায় আমাদের যাহাতে স্থির বিশ্বাস থাকে, আমাদিগকে সেইরূপ জ্ঞানালোক প্রদান কর। আমরা যেন বাক্যে, কার্য্যে, চিন্তায়, নিদ্রায়, জাগরণে, বিপদে, সম্পদে তোমার জাগ্রতাবস্থা অনুভব করিতে পারি। তুমি আমাদিগকে এইরূপ স্মৃতিশক্তি প্রদান কর। হে মহিমাময়! তুমি আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যগত হিংসা, দ্বেষ, শঠতা, বঞ্চনাপূর্ণ মহাভ্রম হইতে রক্ষা কর। আমরা যেন তোমাকে হারাইয়া প্রবৃত্তির দাসত্ব না করি, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

স্বরূপতত্ত্ব।

শান্তং—সমাহিত, শান্তিযুক্ত, ধীর, স্থির, অচল, অটল, গতিরহিত, প্রবাহশূন্য, এই সমুদয় শান্ত শব্দের অর্থমূলক প্রতি-শব্দ। বিষয়ী হইতে বিষয়জগৎ উৎপন্ন হইয়া প্রবাহরূপে ধাবমান হইতেছে। আমাদের প্রত্যক্ষ ও অনুভূত সাকার নিরাকার বিষয়সমূহ কেহই স্থির নহে। সকলেরই গতি আছে। আমরা তো পৃথিবী দোলায় নিয়তই ঘুরিতেছি; ইহা ছাড়া চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ সাকার বস্তুসমূহ এবং নিরা-কার বায়ুরাশি ও বিবিধ শক্তিপুঞ্জ, সকলেরই অল্প বিস্তর গতি আছে। কেবল গতি বা চঞ্চলতা কাহার নাই? যিনি এই গতিশীল বিষয় জগতের পরিচালক, নিয়ামক ও রক্ষক। যাঁহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাদ্বারা জগৎ-কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। সেই নিস্তরঙ্গ জ্ঞানময়ের কোন বিকার, চঞ্চলতা বা অশান্তি নাই। তিনি চিরস্থির, অচল, অটলভাবে স্বপ্রকাশরূপে

পরম শান্তিতে বিরাজিত আছেন। এই জন্য তিনি শান্ত-স্বরূপ। আমাদের স্বভাবসুলভ বুদ্ধি ও চিন্তাদ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রকৃত জ্ঞান যাহা তাহার কোন অবস্থায়, কোন কারণে, ক্ষয় বৃদ্ধি বা চঞ্চলতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। তাহা চিরকাল সমভাবে অবিকৃত অবস্থায় আছে; সুতরাং তাহাতে অশান্তিরূপ মনস্তরঙ্গ উৎপন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মানবের অশান্তি অনেক প্রকারে হইতে পারে; যথা—দেহযন্ত্রের বিকৃত ভাব প্রাপ্ত রূপ, রোগজনিত অশান্তি, ইন্দ্রিয় লালসা ও প্রবৃত্তির তাড়নামূলক মনের আসক্তি ও বিরক্তিজনিত অশান্তি; প্রিয় বিয়োগ ও অপ্রিয় সংযোগ হেতু অশান্তি, পাপের অনুতাপজনিত অশান্তি; সুখ-সম্পদে মত্ততা-জনিত অশান্তি, ঈশ্বর তত্ত্ব লাভের জন্য জ্ঞানপিপাসামূলক ব্যাকুলতাজনিত অশান্তি ইত্যাদি নানা প্রকার অশান্তি মানবের মনে উপস্থিত হয়। কিন্তু জ্ঞানরাজ্যে এই সমুদয় অশান্তির কোন স্থান অর্থাৎ আশ্রয় নাই। অশান্তি সূক্ষ্ম দেহ-রূপ মনোরাজ্যেই বাস করে। সুতরাং আমাদের আমিত্বটা যতক্ষণ জ্ঞানের স্তরে অবস্থিতি করে, ততক্ষণ তাহার অশান্তি দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। সে, নিম্নস্তরে অর্থাৎ অন্তর রাজ্যে আসিয়া অশান্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়। চঞ্চলতা, অস্থিরতা মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; মনের কার্য্য মনন বা চিন্তা করা, সে কোন না কোন চিন্তা লইয়াই থাকে, তা' সচ্চিন্তাই হউক, আর অসচ্চিন্তাই হউক। সে কথনই স্থির থাকিতে পারে না বা চায় না। আবার আমাদের আমিত্বকে ঐ মনো-রাজ্য ত্যাগ করিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞানরাজ্যে বাস করা সম্ভব

হইতে পারে না। কারণ, তাহার সহিত একটা দেহরূপ সংসার রহিয়াছে ; তাহাকে ঐ দেহের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ইন্দ্রিয়লিপ্সা প্রভৃতি নানা প্রকার অভাব যোগের প্রতিবিধান করিতে হয়। কখন বা রোগ, শোক, দুঃখ যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয়। এইরূপ দেহ ও মনের যে কোন প্রকার অভাব ও অশান্তি মোচন জন্য তাহাকে নিম্নস্তর, মনোরাজ্যে অধিক সময় থাকিতে হয়। ইহা তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য।

সুতরাং পরম শান্তিময় জ্ঞানরাজ্যে, ঈশ্বর সন্নিধানে প্রতিনিয়ত বাস করা মানবাত্মার পক্ষে অসম্ভব। অকস্মাৎ পদতলে একটা কণ্টক বিদ্ধ হইলে পরমার্থ জ্ঞান কোথায় হারাইয়া যায়। অতএব জীবাত্মাকে যখন দেহ মন ছাড়িবার উপায় নাই, তখন তাহার অশান্তি নিবারণের কোন উপায় আছে কি না ? গীতা আদি উন্নত হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ যাহা বর্ণিত হইয়াছে, ঐ অবস্থা লাভেই অশান্তি নিবারণের অথবা অশান্তির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু সর্ব্বদা নিম্নস্তর ছাড়িয়া সেই উচ্চ জ্ঞানের স্তরে বাস করা অর্থাৎ সর্ব্বদা জ্ঞানযোগে অবস্থিতি করার ব্যবস্থাটা শুনিতে সুন্দর বটে, কিন্তু উহা পালনপূর্ব্বক কার্য্যে পরিণত করা দুরূহ ব্যাপার। যদি কোন ঈশ্বর ধ্যানে নিমগ্ন জ্ঞানযোগীকে অকস্মাৎ একটা ঢিল ছুঁড়িয়া মারা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহার যোগভঙ্গ হইয়া যায় এবং সে পরমার্থ জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। পাঠক, আমার এই রচিত কথায় উপেক্ষা করিবেন না। এইরূপ দুর্ঘটনা দ্বারা আমরা মুহুর্মুহু আক্রান্ত হইয়া বিপর্য্যস্ত হইতেছি। সুতরাং সর্ব্বদা জ্ঞানযোগে ঈশ্বর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া ঈশ্বরের শান্তিনিকেতনে বাস করা

সংসারী মানবের পক্ষে দুঃসাধ্য। সেই জন্য অশান্তি নিবারণের সহজ ও সুন্দর উপায় নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। উদরাভ্যন্তরে কোন প্রদাহ হইলে চিকিৎসকেরা উদরোপরি প্রত্যুগ্রতা সাধক দ্রব্য প্রয়োগপূর্ব্বক নূতন প্রদাহ আনয়ন করিয়া পুরাতন প্রদাহের শান্তি করেন। ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ নিয়মানুসারে চঞ্চল স্বভাব মনে নূতন একটী অশান্তি সংযোগ করিয়া রাখা ভাবী অশান্তি নিবারণের সুন্দর উপায়। কারণ, মন এক সময়ে যুগপৎ দুইটী চিন্তা লইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং একটী চিন্তা তাহাতে নিয়ত লিপ্ত হইয়া থাকিলে আর একটী চিন্তা আসিয়া স্থান পায় না। মন তখন সেই নূতন কৃত্রিম অশান্তি লইয়াই ব্যস্ত থাকে। সেই নূতন কৃত্রিম অশান্তি হইতেছে, ঈশ্বর লাভে ব্যাকুলতা; এই ব্যাকুলতাজনিত অশান্তি লইয়া যে মন লিপ্ত রহিয়াছে, তাহাতে সাংসারিক কোন অশান্তি স্থান পায় না। কারণ, ঈশ্বর স্বরূপ জ্ঞানময়, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলেই জ্ঞানের পথ দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু জ্ঞানের পথ শান্তিময়, সেখানে অশান্তি স্থান পায় না। অতএব ঈশ্বর লাভে ব্যাকুলতারূপ অশান্তিকে নিয়ত চিত্তে ধারণা করিয়া রাখাই সাংসারিক অশান্তি নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায়। এই ব্যাকুলতাকে সাধু ভাষায় আধ্যাত্মিক ক্ষুধা বলে।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই ক্ষুধা কিসে উৎপন্ন হয়, এই ক্ষুধা অভাব বোধ হইতেই উৎপন্ন হয়। যাহার অভাব বোধ নাই, তাহার ক্ষুধাও নাই, ব্যাকুলতাও নাই। সে বর্ত্তমান লইয়াই অর্থাৎ সে যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থা লইয়া সন্তুষ্ট আছে। তাহার যে আরও উন্নতির আকশ্যক, এ প্রশ্ন তাহার মনে উদয় হয় না।

কিন্তু এরূপ বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট থাকা পশুর ধর্ম্ম। পশুরা ভবিষ্যতের জন্য কোন চিন্তা করে না, সুতরাং মানুষের মধ্যে যাহারা ভবিষ্যতের জন্য না ভাবিয়া কেবল বর্ত্তমানে তৃপ্ত থাকে, তাহাদিগকে নরপশু বলা যায়। ইহাতে বোধ হয় অনেক জ্ঞানে, ধনে, মানে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাঁহাদের ভবিষ্যতের ভাবনা নাই বলিয়া আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু আমি তাহাতে ভয় পাইতেছি না।

কারণ, মানবের সম্মুখে অনন্ত উন্নতির পথ অনন্ত আশার আলোকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং প্রকৃত মানবত্ব লাভ করিবার আশা যাঁহার আছে, তাঁহার কোন প্রকার সাংসারিক বা আধ্যাত্মিক অভাব আছেই আছে। তদ্ভিন্ন অপূর্ণ জ্ঞানবিশিষ্ট মানবের অনন্ত জ্ঞান পিপাসা ও উন্নতির আশা তাঁহার দেহান্তেও নির্ব্বাণ হয় না। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট ও নিশ্চেষ্ট থাকা, মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না, সে যদিও সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন হয়; কিন্তু তাহাকে ঈশ্বর লাভের জন্য অনন্ত জ্ঞানের পথ দিয়া ভক্তিকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এ বোধ যাহার নাই, সে এখনও মনুষ্য নামের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে নাই। অতএব আধ্যাত্মিক ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য অনন্তকে সম্মুখে আদর্শরূপে রাখিয়া আপনার দৈন্যতা অনুভবপূর্ব্বক তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে হইবে। এই দৈন্যতা ভালরূপ অনুভূত হইলে, তাহা নিবারণের জন্য আপনিই ব্যাকুলতা উপস্থিত হইবে। এই ব্যাকুলতাজনিত অশান্তি লাভই সাংসারিক অশান্তি নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায়। এক্ষণে, জ্ঞানের চঞ্চলতা নাই, ক্ষয় বৃদ্ধি নাই, অশান্তি নাই, এই সম্বন্ধে একটী গল্প

দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করা যাইতেছে। মনে কর, কোন ভদ্রলোক প্রাতে উঠিয়া নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত তাঁহার বিষয়কর্ম্মের হিসাবপত্র পর্য্যবেক্ষণ করেন। পরে আহারান্তে কোন উচ্চ বিচারালয়ে যাইয়া ব্যবহারাজীবের কার্য্য করেন, এবং সন্ধ্যার পর কোন রঙ্গালয়ে পাগলের অভিনয় করেন। তিনি যখন পাগলের অভিনয় করেন, তখন তাঁহাকে ঠিক উন্মাদগ্রস্ত বলিয়াই বোধ হয়, তিনি যে আইনের কূটতর্ক মীমাংসাপূর্ব্বক ব্যবহারাজীবের কার্য্য করেন, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তিনি এইরূপ রাত্রিতে পাগলের অভিনয় করিয়া, নিদ্রান্তে প্রাতে উঠিয়া সৌম্যমূর্ত্তিতে বসিয়া তাঁহার কার্য্য ঠিক পূর্ব্ববৎ নিপুণতা সহকারে করিতে লাগিলেন। এস্থলে তিন প্রকার তিনটী কার্য্য, এক-জনের ব্যক্তিগত জ্ঞান দ্বারা সাধিত হইলেও জ্ঞানের কোন ব্যতিক্রম হইল না। কোন ব্যক্তি প্রিয় বিয়োগজনিত হৃদয়-বিদারক শোকে অধীর হইয়া উন্মত্তপ্রায় হইল; আহার নিদ্রা, কাজ কর্ম্ম ভুলিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দুই চারি দিন পরে দেখা গেল, একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। দুই তিন মাস পরে দেখা গেল, বেশ কাজকর্ম্ম করিতেছে; তবে তাহার অন্তরে যেন কি কষ্ট লাগিয়া আছে; তাহাতে সর্ব্বদা তাহার মুখশ্রী ম্লান। পরে বৎসরান্তে দেখা গেল, সে সম্পূর্ণ পূর্ব্ব ভাব প্রাপ্ত হইয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। এরূপ পরিবর্ত্তনে তাহার কি জ্ঞানের কোন ক্ষয়, বৃদ্ধি, বিকার বা পরিবর্ত্তন হইল? না, তাহা হয় নাই। তবে সে লোকটা সাধারণ সংসারী লোক, কাজকর্ম্ম করিয়া খায়, বেড়ায়; জ্ঞানোপার্জ্জনের পথে কখন হাঁটে নাই। কাজেই অকস্মাৎ মমতা ও আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হওয়ায় সে তাহা

সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহার স্বাভাবিক সহজ জ্ঞান কাজে ফেরে যেটুকু লাভ করিয়াছিল, তাহা মনস্তরঙ্গের আঘাতে হারাইয়া গিয়াছিল ; এক্ষণে তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইল। তাহার জ্ঞানের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে জ্ঞান, সেখানে অশান্তি নাই ; যেখানে অজ্ঞানতা, সেখানেই অশান্তি। অতএব আমরা অজ্ঞানতামূলক অশান্তি নিবারণের জন্য সেই পরম জ্ঞানময় শান্তির আধার বিশ্বপতির নিকট প্রার্থনা করি।

প্রার্থনা।

হে শান্তস্বরূপ! তুমি আমাদিগকে তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় দান করিয়া এই নিদারুণ সংসার যন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর। তোমাকে আমরা চিনিতে না পারিয়া বিষয় জগতের আশ্রয় গ্রহণ করি, কিন্তু তথায় শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া পুনরায় তোমারই শরণাপন্ন হই। হে দয়াময়! তোমার এই হতভাগ্য সন্তানদিগকে শান্তির পথ দেখাইয়া দেও। আমরা যখন প্রিয় বিয়োগজনিত শোকে অধীর হই, তখন তুমি একবার তোমার কথা স্মরণ করাইয়া দিও। আমরা যেন তোমার আশ্রিত থাকিয়া বৈষয়িক সংযোগ-বিয়োগজনিত শোকে ধৈর্য্যচ্যুত না হই। তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। আমরা যেন সর্ব্বদা তোমাকে পাইবার জন্য, তোমার আশ্রিত হইবার জন্য তোমার বিয়োগজনিত অশান্তি ভোগ করি। হে পরম পিতা! তুমি যখন যে কার্য্যে আদেশ কর, তাহাতে যেন আমরা ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া শান্তভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে

পারি; তুমি আমাদের মনে এইরূপ বলদান কর। দুর্দ্দম্য নীচ প্রবৃত্তিসমূহ উত্তেজিত হইয়া উঠিলে যেন তোমাকে স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারি। আমরা যেন অবিচলিতচিত্তে তোমার দুঃখ যন্ত্রণারূপ অনুগ্রহ প্রকাশ সহ্য করিতে পারি। হে পরমাত্মন্! যখন তুমি পরিবারস্থ প্রিয় সুহৃদ্‌গণকে আমাদের ক্রোড় হইতে তোমার অমৃত ক্রোড়ে লইয়া যাও, তখন বিচ্ছেদ যাতনায় আমরা অধীর হইয়া তোমাকে ধন্যবাদ করিতে ভুলিয়া যাই, এই জন্য তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর। সমুদয়ই যে তোমার বস্তু, উহাতে আমাদের যে কোন দাবি দাওয়া নাই; ইহা যেন আমরা স্মরণ রাখিতে পারি।

স্বরূপতত্ত্ব।

শিবং—মঙ্গলময়, মঙ্গলস্বরূপ, কল্যাণের প্রতিমূর্ত্তি; মঙ্গলের আধার। আমরা সসীম ক্ষুদ্রবুদ্ধিযুক্ত মানব; আমাদের যাহা প্রীতিজনক ও উপকারী, তাহাকেই আমরা মঙ্গলজনক বলি। যাহা অপ্রীতিকর ও বৈষয়িক হানিজনক, তাহাকে অমঙ্গলজনক বলি। এইরূপ মঙ্গলামঙ্গলের ঘাতপ্রতিঘাতে সাধারণ মানব-জ্ঞান নিয়তই তরঙ্গায়িত হইতেছে। কিন্তু সাধারণের মধ্যে যাঁহারা উন্নত প্রকৃতির মানব, তাঁহাদের মঙ্গলামঙ্গল অনেকটা অন্য প্রকার। তাঁহারা বর্ত্তমানে তৃপ্তিকর, মঙ্গলজনক বিষয় লইয়া তৃপ্ত থাকেন না। তাঁহারা তাঁহাদের আত্মার উন্নতির জন্য সর্ব্বদা উৎসুকচিত্তে উপস্থিত বিষয়ের অভ্যন্তরে মঙ্গলা-মঙ্গলের হেতু অনুসন্ধান করেন। উপস্থিত বিষয় বা ঘটনা প্রিয়, অপ্রিয় যাহাই হউক, তাহা যদি আত্মার উন্নতির সহায়

মনে করেন, তাহা হইলে তাহা সাদরে গ্রহণ করেন। ইহা হইল, জ্ঞানপিপাসু উন্নতিকামী মানব প্রকৃতির লক্ষণ। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও উন্নত স্তরের মানব যাঁহারা, যাঁহাদিগকে প্রকৃত জ্ঞানী, স্থিতপ্রজ্ঞ বা জীবন্মুক্ত বলা যায়, অর্থাৎ যাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণ, তাঁহারা শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক কোন প্রকার মঙ্গলামঙ্গলের ধার ধারেন না। তাঁহারা সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় গা ঢালিয়া দিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছেন। সাংসারিক সুখ দুঃখ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহারা পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে সংসারে বাস করেন। তাঁহাদের আত্মা সেই নিত্য মঙ্গলময়ের নিভৃত রাজ্যে বাস করে। তাঁহাদের ব্যক্তিগত আমিত্ব, যাহা মঙ্গলামঙ্গলের ঘাত প্রতিঘাতে সুখ দুঃখ ভোগ করিত, সে আমিত্ব চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহারা এক্ষণে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন; অবস্থা বিশেষে যদি তজ্জন্য স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার আবশ্যক হয়, তাহাও সহাস্যবদনে দিতে প্রস্তুত আছেন। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে এ গ্রন্থে উপদেশ দিবার কিছু নাই। যাঁহারা সংসারপরায়ণ, নিরাপদে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য; মঙ্গলামঙ্গলের বিচার তাঁহাদের জন্য। এক্ষণে দেখা যাউক, এই মঙ্গলামঙ্গলের মূল কোথায়? ইহার মূল হইতেছে, আমাদের বুদ্ধিগত বিচারলব্ধ অভিজ্ঞতায় অর্থাৎ বিবেকের উপর। যাঁহার যেরূপ বিবেক, তাঁহার মঙ্গলামঙ্গল বোধও সেইরূপ।

এই মঙ্গলের ভাব মানব বিষয়-জগৎ হইতে দুই দিক দিয়া

গ্রহণ করে। অজ্ঞান যে ব্যক্তি, সে তাহার ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতা-মূলক ক্ষুদ্র আমিত্বের দিক হইতে যাহা প্রীতিকর মনে করে, তাহাই মঙ্গলজনক বলিয়া গ্রহণ করে। আর যিনি জ্ঞানী, বিবেকবান্, তিনি মঙ্গলামঙ্গলের ভাব গ্রহণ করেন, ভূমিত্বের অর্থাৎ জগতের দিক হইতে, সাধারণের দিক হইতে, সমষ্টির দিক হইতে। উপস্থিত বিষয় প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর যাহাই হউক, তাহা যদি সাধারণের মঙ্গলজনক হয়, তাহা হইলে তাহাই সাদরে গ্রহণ করেন। আর যদি ব্যক্তিগত প্রীতিকর ও আপাত মঙ্গল-জনক বিষয়; সাধারণের অর্থাৎ জগতের অমঙ্গলজনক হয়, তাহা হইলে তাহা ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করেন। মনে কর, পৃথিবীতে চিরবসন্ত বিরাজমান থাকিলে ঋতু বিপর্য্যয়জনিত শারীরিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না। এই আপাত প্রীতিকর বিষয়টা প্রার্থনীয় কিনা দেখা যাউক।

বর্ষাকালে পল্লীগ্রামের রাস্তাঘাট দূষিত কর্দ্দমরাশিতে পূর্ণ হইয়া দুর্গম হইয়া থাকে; বিবিধ উদ্ভিজ্জপূর্ণ জঙ্গলরাশি জলমগ্ন হইয়া দূষিত বাষ্প উৎপাদনপূর্ব্বক সংক্রামক রোগের সৃষ্টি করে। প্রত্যেক ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় মনুষ্যের অভ্যস্ত শীতাতপের পরি-বর্ত্তনে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া বিবিধ পীড়া উৎপাদন করে। এই সমুদয় ক্লেশকর ও পীড়াজনক হেতু ঋতু বিপর্য্যয়ের মধ্যে থাকিলেও উহা মানবের অমঙ্গলজনক বলিয়া অপ্রার্থনীয়; এবং সুখকর চিরবসন্ত প্রার্থনীয় হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, ঋতু বিপর্য্যয় দ্বারাই আমাদের এদেশে শস্যোৎপন্ন হইয়া জনসাধারণের জীবন রক্ষা করে। চিরবসন্ত বিরাজিত হইলে শস্যাভাবে দুর্ভিক্ষ উৎপন্ন হইয়া অন্নাভাবে জনপদ ধ্বংস হইতে পারে।

সুতরাং ঐ আপাত প্রীতিজনক চিরবসন্ত কখনই মানবের প্রার্থনীয় হইতে পারে না। তাই কোন কবি বলিয়াছেন, "স্বল্প ক্ষতি মূলীভূত প্রভূত মঙ্গল; তোমা হেন বিজ্ঞ কাছে নিন্দিত কেবল।" এস্থলে কবি বিদ্রূপচ্ছলে মূর্খকে বিজ্ঞ বলিতেছেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, কোন বিষয় আপাততঃ স্বল্প ক্ষতির কারণ হইলেও পরিণামে যদি প্রভূত মঙ্গলজনক হয়, তাহা মূর্খের নিকট নিন্দিত হইতে পারে বটে, কিন্তু জ্ঞানীর নিকট তাহা কখনই নিন্দনীয় হয় না। প্রকৃত পক্ষে, যে বিষয় ঈশ্বরের আদেশ পালনের অনুকূল, তাহাকেই মঙ্গলজনক বলা যায়। তাহার সাক্ষাৎ ও পরম্পরিত ক্রিয়ার মধ্যে কিছু কিছু বিরুদ্ধ-ভাব থাকিলেও তাহাতে কিছু আসে যায় না। মনে কর, তোমার শরীরস্থ কোন স্থানে একটী সুপক্ব ব্রণে অস্ত্রাঘাত দ্বারা তাহার পূঁযাদি বহির্গত না করিলে ভবিষ্যতে দুঃসাধ্য নাড়ীব্রণ নামক সাংঘাতিক রোগ উৎপাদন করিতে পারে; এস্থলে কার্য্যটী ভয়ঙ্কর ও অপ্রীতিকর হইলেও তোমার আত্মরক্ষার অনুকূল বলিয়া ঐ ভীষণ কার্য্যকে সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের আদেশ পালনরূপ আপনার দেহ রক্ষা করিতে হইবে।

তোমার একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, কিন্তু ক্রন্দন করিল না; ইহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে চারিদিকে নিরাশার অন্ধকারে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল; সকলেই অনুমান করিতে লাগিলেন, মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; কিয়ৎক্ষণ পরে সেই নবাগত শিশুর ক্ষীণস্বরযুক্ত ক্রন্দন ধ্বনি কর্ণগোচর হইলে সকলেই আশ্বাসিত ও প্রকৃতিস্থ হইলেন; ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারা গেল যে, শিশু জীবিত আছে। এস্থলে ঐ ক্রন্দন তাহার মঙ্গলসূচক

চিহ্নস্বরূপ। কোন দুষ্ট বালক বিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া বাটী প্রত্যাগমন কালে তাহার সহপাঠীর সঙ্গে পরিচয় দিতেছে যে, বর্ত্তমান শিক্ষকটী না মরিলে আমাদের আর রক্ষা নাই; ইহার প্রহার যন্ত্রণা অসহ্য হইতেছে। ইহা শুনিয়া তাহার বুদ্ধিমান্ কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিতেছে—না দাদা, শিক্ষক মরিয়া কোন লাভ নাই, বাবা আর একটা শিক্ষক আনিবেন; কিন্তু বাবা মরিলে সকল গোল মিটিয়া, যাইত, আর আমাদিগকে বিদ্যালয়ে আসিয়া প্রহৃত হইতে হইত না।

পাঠক! এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, আমাদের মঙ্গলামঙ্গল বোধ ঐ বালকের ন্যায়। শিক্ষক বালককে সংশোধনের জন্য বেত্রাঘাত করিতেছে, বালক তখন দুঃখে অভিভূত হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে, কিন্তু তাহার পরম হিতৈষী পিতামাতা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিয়া আনন্দিত ও আশ্বাসিত হইতেছেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন, এইবার পুত্র সংশোধিত হইয়া উৎকৃষ্ট চরিত্র লাভ করিয়া গৃহ উজ্জ্বল করিবে। পাঠক! দেখ দেখি, পিতামাতাও বালকের কি আশ্চর্য্য মনোভাবের বৈষম্য। পর্ব্বতের সহিত বালুকাকণার যে প্রভেদ অর্থাৎ বালুকাকণা যত ক্ষুদ্র, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় একটী মনুষ্য তদপেক্ষা অধিক ক্ষুদ্র; সুতরাং এই অনন্ত বিশ্বের কর্ত্তা যিনি, তাঁহার মঙ্গলামঙ্গলের ভাব ক্ষুদ্র মানব সসীম বুদ্ধি দ্বারা কি করিয়া বুঝিতে পারিবে। তাই কোন সাধু বলিয়াছেন, "ওরে পোদো, তুই আম খেয়ে নে, বাগানে কত গাছ, কোন গাছটী কি প্রকার তা' তোর দরকার কি?"

বাস্তবিক তাঁহার সম্বন্ধে মঙ্গলামঙ্গলের বিচার করিতে যাওয়া আমাদের অনাধিকার চর্চ্চা। তবে তিনি যে মঙ্গলময়, ইহাতে

সন্দেহ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। তিনি বিশ্বরূপে প্রকাশিত হইয়া যখন পদ্মপত্রস্থিত বারির ন্যায় নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন, তখন তাহাতে অমঙ্গল স্পর্শ করিবে কিরূপে? অতএব তিনি যে আমাদের সাংসারিক মঙ্গলামঙ্গলের অতীত পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ; স্বপ্রকাশ, সৌন্দর্য্যপূর্ণ, পূর্ণজ্যোতি-স্বরূপ, এই বিশ্বাস দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিতে হইবে। তা' বুঝিতে পার আর নাই পার আমি তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে, মঙ্গল উদ্দেশ্যে অন্ধ বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করিতেছি; কারণ আমরা সম্পূর্ণরূপে অমঙ্গলজনক ব্যাপারের মধ্যে তাঁহাকে মঙ্গলময় বলিয়া ধরিতে পারিব না। আমাদের বুদ্ধি শক্তিতে সঙ্কুলান হইবে না। এই জন্যই পাঠক! আমি এই অনুরোধ করিতেছি। আমাদের বুদ্ধির দোষে আসক্তি ও মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মঙ্গলকে অমঙ্গলরূপে প্রতিপন্ন করিয়া অধৈর্য্য হই এবং প্রকৃত অমঙ্গল যাহা, তাহাকে মঙ্গল বলিয়া বরণ করিয়া লই। পাঠক! তোমার জীবন নাটকের অভিনয়গুলি স্থিরচিত্তে অনুধাবন পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখ, যেখানে দুঃখ কষ্ট ও অভাব, সেইখানেই শিক্ষাপ্রাপ্তি ও আত্মার উন্নতি। অমঙ্গল না থাকিলে মঙ্গলের কোন অর্থ থাকিত না এবং মঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া চিনিতে পারা যাইত না। অমঙ্গল না থাকিলে অবিচ্ছিন্ন বিষয়-সুখে মানব আত্মহারা হইয়া অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া থাকিত। তাহার প্রত্যক্ষ জগতের পদার্থসমূহের গুণ ক্রিয়ার সহিত পরিচিত হইবার কোন আবশ্যক হইত না। কারণ যাহার কোন অমঙ্গল নাই, তাহার অভাবও নাই। কিন্তু অভাব ও আবশ্যক না থাকিলে কর্ম্ম-জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে আত্মরক্ষা ও কর্ত্তব্য সম্পাদনের

জন্য বিবিধ নিয়ম শৃঙ্খলা স্থাপন, নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়মূলক যন্ত্রাদির আবিষ্কার, অনধিকৃত ও অসম্ভাবিত বস্তু প্রাপ্তির উপায় নির্দ্ধারণ ইত্যাদি কোন কিছুই হইত না। মানুষ স্বীয় স্বীয় মঙ্গল লইয়া ভোগবিলাসের ক্রোড়ে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাইত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন হইতে মানবকুল চিরবঞ্চিত থাকিত। রোগ, শোক, দুঃখ, যন্ত্রণা ইত্যাদি অমঙ্গল না থাকিলে মানবের সাবধানতা, অনুসন্ধিৎসা, কর্ম্মনিপুণতা ইত্যাদি উৎকৃষ্ট শক্তিসমূহ চিরদিনের জন্য অবিকশিত অবস্থায় থাকিয়া মানুষকে জড় ভাবাপন্ন করিয়া রাখিত। যাহার কখন কোন অমঙ্গল বা বিপদ ঘটনা হয় নাই, সে লবণের পুত্তলিকা স্বরূপ, সামান্য দুর্ঘটনার বাতাসে গলিয়া যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি সংসারের ঘাত প্রতিঘাতরূপ বহুবিধ বাধা বিঘ্ন, মঙ্গলামঙ্গল ও সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া তাঁহার কর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় বজ্রের ন্যায় কঠিন হইয়া গিয়াছে। সামান্য দুঃখ, বিপদ বা অমঙ্গলের চিহ্ন দেখিলে তাঁহার আত্মা চঞ্চলতা প্রাপ্ত হয় না। এই যে শীতপ্রধান দেশবাসী কষ্টসহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী, অসীম শক্তিশালী ইংরেজ জাতি আমাদের দেশে রাজত্ব করিতেছেন; ইহার কারণ হইতেছে, তাঁহাদের অভাব-জনিত অমঙ্গল। আমাদের ভারতবর্ষে মানবের প্রধান আবশ্যকীয় খাদ্য পরিধেয়াদির অভাব ছিল না বলিয়া প্রাচীনগণ সমুদ্রযাত্রাকে পাপ কার্য্য বলিয়া গণ্য করিতেন। বিদেশ গমনটা তাঁহাদের অনাবশ্যক ও অপ্রীতিকর ছিল; কিন্তু পাশ্চাত্য সুসভ্য জাতি তাঁহাদের অভাবটা মঙ্গলের হেতু বলিয়া গ্রহণ করিয়া সমুদ্রযাত্রা করতঃ দেশদেশান্তরে গমনাগমনপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গীন

উন্নতির চরম সীমায় পদার্পণ করিয়া মনুষ্যসমাজের উন্নত আদর্শ লাভ করিয়াছেন। আর আমরা আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয় চরিতার্থতারূপ সুখ ও বিবিধ ভোগবিলাসকে জীবনের আদর্শ করিয়া এ জন্মে ঘরের বাহির হইতে পারিলাম না।

গীতায় আছে--রোগ, শোক, দুঃখ, দরিদ্রতা প্রাপ্তি পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতির ফল। ইহা যেন অকস্মাৎ প্রলাপ বাক্য বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বাস্তবিক প্রলাপ নহে। কত শত ব্যক্তি রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্যের তাড়নায় সংসারাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্ম পথ অবলম্বন করতঃ উন্নত জীবন লাভ করিয়াছেন, ইহার প্রমাণের অভাব নাই। এক্ষণে তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত দুঃখ কষ্টরূপ অমঙ্গলগুলি প্রভূত মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। অতএব পাঠক! আর আমরা কোন প্রকার অমঙ্গল দেখিয়া নিরাশার অন্ধকারে হতাশ্বাস হইয়া হায় হায় করিব না; উহা ভাবী মঙ্গল ও উন্নতির হেতুরূপে বরণ করিয়া লইব। কিন্তু ইহার মধ্যে একটী আপত্তি হইতে পারে, যে স্থলে মঙ্গলের হেতু বলিয়া আমাদের বুদ্ধি অমঙ্গলকে গ্রহণ করিতে চায় না, যেখানে আমাদের বিচার-শক্তি পরাস্ত হয়, সে স্থলে কি হইবে? যেমন কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা দ্বারা কোন বিস্তীর্ণ জনপদ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। উপযুক্ত সতর্ক থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞাত কোন কারণে কোন ব্যক্তির গৃহদাহ হইয়া সর্ব্বনাশ হইল। কোন বৃদ্ধ ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জীবনের একমাত্র আশাস্থল অন্ধের যষ্টিস্বরূপ বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র অকস্মাৎ লোকান্তরিত হইল। কিম্বা কোন ব্যক্তির বার্দ্ধক্যে একটী জন্মান্ধ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহার সুখের সংসারে দুঃখ স্রোত বর্দ্ধিত করিয়া দিল; এই সমস্ত ব্যাপারগুলিকে উপস্থিত বা

ভাবী মঙ্গলের হেতু বলিয়া গ্রহণ করা বড়ই কষ্ট-কল্পনা। ইহাতে মনকে প্রবোধ দেওয়া বড়ই কঠিন। কাযেই ঈশ্বরের ন্যায়পরতাকে অস্বীকার করিয়া তাঁহার যথেচ্ছাচারিতা ও অবিচারের ফল বলিয়া সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায়পরতাকে অস্বীকার করিয়া মানব মন অধিক সময় তৃপ্ত থাকে না; তখন ঈশ্বরের অপক্ষ-পাতিত্বযুক্ত স্বাধীন জ্ঞানলীলার কথা স্মরণ হইয়া তাঁহাকে দোষা-রোপ করিতে প্রবৃত্তি থাকে না। সুতরাং মনকে প্রবোধ দিবার জন্য অদৃষ্টবাদ, কর্ম্মফলবাদ, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি কল্পনার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও মন নিঃসন্দেহরূপে শান্তিলাভ করে না। কারণ, ঐ সমস্ত কাল্পনিক মীমাংসার গোড়া পাওয়া যায় না। গৃহদাহ প্রযুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ভাবিয়া লইতে পারে যে, আমি পূর্ব্বজন্মে কাহাকেও ঐরূপ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছি; কিন্তু আবার সেই পূর্ব্বজন্মে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, সেও ঐরূপ ভাবিতে পারে; সুতরাং ইহার গোড়া ধরা গেল না। তৎপরে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহস্বামী তাহার সযত্নে রক্ষিত কোষ্ঠি-পাতখানি খুলিয়া দেখিলেন; তাহাতে লেখা আছে, "অমুক সময়ে অমুক গ্রহের বিষদৃষ্টির ফলে ভয়ানক ক্ষতি হইবে।" সুতরাং তাহার বয়সের হিসাবে আনুমানিক ভাবে খাটিয়া গেল বটে, কিন্তু সেই পরিবারভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণের কোষ্ঠিপাত দেখা গেল তাহাদের গ্রহফল মন্দ নহে; তবে যে তাহারা এই দারিদ্র্য দুঃখের ভাগী হইয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে কেন, ইহা বলা বড় শক্ত কথা। যাহা হউক, এই সমুদয় মীমাংসা ভিত্তিহীন ও সন্দেহের উপর স্থাপিত। এক্ষণে সংক্ষেপে ইহার একটা বিচার মীমাংসা করিয়া লওয়া যাইতেছে।

মনে কর, তুমি কলিকাতাস্থ কোন উৎকৃষ্ট পল্লীতে বহু অর্থ ব্যয়ে বাটী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে বাস করিতেছিলে, অকস্মাৎ রাজকীয় কর্ত্তৃপক্ষ হইতে আদেশপত্র আসিলে যে, তিন মাসের মধ্যে বাটী ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইবে। তোমার ইহাতে কোন দোষ ক্রটী না থাকা সত্ত্বেও এই আকস্মিক বিপদের কারণ অনুসন্ধান করিয়া অতি কষ্টে জানা গেল, স্থানটী কর্ত্তৃপক্ষ বাগানবাটী করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; তখন তোমার কোন ক্রটী না থাকা সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষের আবশ্যক বলিয়া বাধ্য হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ত্যাগ করিতে হইল। এইরূপ এই সংসাররূপ সহরের কর্ত্তৃপক্ষ যিনি, তাঁহার কখন কোথায় কি আবশ্যক হয়, কোথায় জীবকুল ধ্বংস করিতে হয়, কোথায় জীব দ্বারা পরিপূর্ণ করিতে হয় তাহা তিনিই জানেন; আমরা বহু লক্ষ প্রকার জীবসমূহের মধ্যে এক প্রকার ক্ষুদ্র জীব, আমরা তাঁহার অনন্তলীলার, তাঁহার মহিমার কি বুঝি; তাই আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে অন্ধবিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার ইচ্ছায় গা ঢালিয়া দিতে হইবে। তিনি যাহা করিয়াছেন মঙ্গলের জন্য, যাহা করিতেছেন তাহাও মঙ্গলের জন্য এবং যাহা করিবেন তাহাও মঙ্গলের হেতু হইবে; এই বিশ্বাস মনে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতে হইবে। উপস্থিত জগৎ এরূপ না হইয়া অন্য প্রকার হইলে ভাল হইত, অথবা অন্য প্রকার হইতে পারিত, মনে মনে এরূপ কল্পনা করিয়া বৈষম্যের সৃষ্টি করা বিড়ম্বনা মাত্র। সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার বিধান গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই মঙ্গলজনক। এস্থলে আর একটী গল্প করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। পাঠক ইহাতে বিরক্ত হইবেন না।

মনে কর, তুমি আমি অন্য কয়েকটী বন্ধু-বান্ধবসহ একত্রযোগে পরস্পর আমোদ-প্রমোদের জন্য আমরা একটী যাত্রার দল স্থাপন করিলাম। তাহাতে বিবিধ অভিনেতা ও অভিনেত্রী লইয়া অভিনয় করিতে হইবে। সুতরাং আমাদের মণ্ডলীবদ্ধ বন্ধু-বান্ধবদিগের মধ্যে কেহ রাজার পাঠ লইয়া রাজকীয় পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া রাজার অভিনয় করিতে লাগিলেন; কেহ ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া মলিন বেশে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া অনশনক্লিষ্ট ভিক্ষুকের অভিনয় করিতে লাগিলেন; কেহ অন্ধের পাঠ লইয়া সভাস্থলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধের অভিনয় করিতে লাগিলেন; কেহ পুত্রশোকাতুরা রোরুদ্যমানা জননীর পাঠ লইয়া সভাস্থলে পাগলিনীর ন্যায় তাঁহার দুঃসহ পুত্রশোকের পরিচয় দিতে লাগিলেন। কেহ পাপের প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ অধার্ম্মিকের বেশে উপস্থিত হইয়া পৈশাচিক বৃত্তি চরিতার্থের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। কেহ মুনির পাঠ লইয়া সভাস্থলে উপস্থিত শ্রোতাগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক মোহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই অভিনয়ের নির্ব্বাচিত বিষয়-গুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া দর্শকবৃন্দের মনস্তুষ্টির জন্য যখন যে স্থলে যেরূপ অভিনেতার আবশ্যক তাহাই অনুসন্ধানপূর্ব্বক ব্যক্তি-বিশেষকে যোগ্যতানুসারে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ সমুদয় অভিনেতা নির্ব্বাচন করিবার সময় দেখা হইয়াছিল যে, কোন্ ব্যক্তি কোন্ পাঠ লইয়া সেই বিষয়ের ভাল অভিনয় দেখাইতে পারিবে। তাহাতে ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, নীচ, উচ্চ এই সমুদয়ের বিচার করিয়া নির্ব্বাচন করা হয় নাই। অর্থাৎ দলের মধ্যে যে ধনীর সন্তান তাহাকে রাজার পাঠ দেওয়া

হউক, আর যে দরিদ্রের সন্তান তাহাকে ভিক্ষুকের পাঠ দেওয়া হউক, এরূপ বিচার করা হয় নাই। উপযুক্ততা দেখিয়াই পাঠ দেওয়া হইয়াছে।

পাঠক! এক্ষণে কল্পনাপূর্ব্বক ঐ যাত্রাদলের স্বত্বাধিকারীর স্থলে ঈশ্বরকে বসাও এবং তাঁহার এই সংসাররূপ রঙ্গমঞ্চে, তাঁহার এই বিচিত্র লীলারূপ অভিনয়, মনে কল্পনাপূর্ব্বক সূক্ষ্ম রিয়া বুঝিয়া দেখ, এই সংসারলীলারূপ অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে গেলে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় অভিনেতাগুলির আবশ্যক। পাপী, পুণ্যবান, ধনী, ভিক্ষুক, নরপিশাচ, মুনি, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান্ ইত্যাদি সকল প্রকার অভিনেতার দরকার। ইহার সামান্য একটীর অভাব হইলে, তাঁহার এই বিচিত্র লীলারূপ অভিনয় অপূর্ণতা ধারণ করিবে। অতএব আইস পাঠক! তুমি, আমি এবং অন্যান্য আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও ভ্রাতাগণ আমরা তাঁহার বিচিত্র লীলার সহযোগীরূপে যিনি যে পাঠ লইয়াছি অর্থাৎ যে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করতঃ সেই অনন্ত মহিমাময়ের আদেশ পালন করি। আমরা আর অন্যের অভিনয়ের বিষয় লইয়া বিচার করিতে যাইব না। এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের দলের স্বত্বাধিকারী যিনি তাঁহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ ও মঙ্গলভাবপূর্ণ। তিনি আমাদের কার্য্যফল দেখিয়া নিশ্চয়ই উপযুক্ত পুরস্কৃত করিবেন। ইহাই মীমাংসা করিয়া লওয়া হইল। তিনি আমাদের সম্মুখে প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর, সুখসাধ্য ও কষ্টসাধ্য, মঙ্গলজনক ও অমঙ্গলজনক যাহাই উপস্থিত করুন, তাহা দেখিয়া তাঁহার সার্ব্বভৌমিক অবিচ্ছিন্ন মঙ্গল উদ্দেশ্যে অবিশ্বাস করিব না।

মঙ্গলই যে তাঁহার স্বভাব, মঙ্গলই যে তাঁহার স্বরূপ এই বিশ্বাস আমরা দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিব।

প্রার্থনা।

হে শিবস্বরূপ বিশ্ববিধাতা! তুমি আমাদিগকে মঙ্গলের পথে লইয়া চল। তোমার মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক। আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ অমঙ্গলকে মঙ্গলরূপে বরণ করিয়া লইতেছি এবং মঙ্গলকে অমঙ্গল বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি। হে দয়াময়! তুমি আমাদিগকে মঙ্গলবিধান দেখাইয়া দিয়া এই ভ্রম হইতে রক্ষা কর। হে পরম পিতা! আমরা তোমার অবাধ্য ও দুর্বিনীত সন্তান। আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া সৎপথে আনিবার জন্য কত প্রকার রোগ, শোক, দুঃখ, বেদনা দিতেছ; আমরা তাহা না বুঝিতে পারিয়া তোমাকে কত প্রকার দোষারোপ করি; অতএব হে মঙ্গলময়! তুমি আমাদের এই অপরাধ ক্ষমা কর। আমাদের যেন তোমার মঙ্গল ইচ্ছার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে; আমাদের মনে এইরূপ বলদান কর। আমরা যেন তোমার অনুগ্রহ প্রকাশরূপ সাংসারিক দুঃখ, যন্ত্রণা অবলীলাক্রমে সহ্য করিতে পারি, আমাদিগকে এইরূপ শক্তি প্রদান কর।

স্বরূপ তত্ত্ব।

সুন্দরং—অর্থ সৌন্দর্য্যপূর্ণ, শোভাময়, সন্তোষকর, মনোহর, উৎকৃষ্ট ইত্যাদি। সাধারণ জীব-জগতের মধ্যে মানব-জ্ঞানের বিশেষত্ব এই যে, তাহাদের জ্ঞানে স্বভাবতঃ স্বপ্রকাশরূপে একটা সৌন্দর্য্যের আলোক রহিয়াছে। সেই আলোকের সাহায্যে সে

সমুদয় বিষয়ের উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্টত্বের বিচার করিয়া নিকৃষ্টকে পরিত্যাগপূর্ব্বক উৎকৃষ্টকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। এই সৌন্দর্য্যের আলোক মূর্খ, জ্ঞানী, সকল মানবের পক্ষে সমান হইলেও ঐ আলোকের সাহায্যে অন্তর ও বাহ্যজগতের বিষয় সমূহের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের আস্বাদন শক্তি সকলের পক্ষে সমান নয়। ইহার কারণ এই যে, মূর্খের মধ্যে যে সৌন্দর্য্যের আলোকটী আছে, তাহা অনভিজ্ঞতারূপ অজ্ঞানতার আবরণে ঢাকা রহিয়াছে। ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আর জ্ঞানীর মধ্যে যে আলোকটী আছে, তাহাতে অজ্ঞানতার আবরণ না থাকায় উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

স্বভাবতঃ মনুষ্য মাত্রেই সৌন্দর্য্যপ্রিয়; সে সর্ব্বদাই সৌন্দর্য্যের অনুসরণ করে। ঈশ্বরের অনুপ্রকাশরূপী প্রত্যেক মানবে যে স্বাভাবিকরূপে সৌন্দর্য্যের আলোক রহিয়াছে, তাহা তাহাদের এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা দেখিয়া প্রতীয়মান হয়। এই যে প্রত্যেক মানবের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, ইহা ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার ব্যষ্টি ভাবের প্রকাশ, ইহা দেখিয়া এবং জগতের অসীম বিচিত্র শোভা সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, সমষ্টিরূপী জগৎকর্ত্তাও স্বভাবতঃ সৌন্দর্য্যপ্রিয় ও সৌন্দর্য্যময়। তিনি যে আমাদের আত্মাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিষয়গত সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী হইয়া সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের আস্বাদন ও সম্ভোগপূর্ব্বক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তায় পরিচয় দিতেছেন; ইহার মূল হইতেছে, তিনি স্বয়ং সৌন্দর্য্যপ্রিয়। তাঁহার স্বভাবই সৌন্দর্য্যময় এইজন্য জ্ঞানীরা তাঁহার একটী স্বরূপগত নাম রাখিয়াছেন "সুন্দরং"। তিনি আমাদের অন্তরে যেমন সৌন্দর্য্যের আদর্শ প্রদান করিয়া

সৌন্দর্য্যের পথে লইয়া যাইতেছেন, বাহ্যজগতেও সেইরূপ তাঁহার বিচিত্র সৌন্দর্য্যরাশির বিকাশ করিয়া তাঁহার লীলাময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৌন্দর্য্যপূর্ণ করতঃ তদ্দ্বারা আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার প্রকাশময় বিশ্বরূপে, নিরাকার সাকার সকলই সুন্দর। এক্ষণে বাহ্যজগতের সৌন্দর্য্য কিরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহা দেখান যাইতেছে। প্রথমতঃ চাক্ষুষ দৃষ্টভাবে বস্তুর রূপগত সৌন্দর্য্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানদৃষ্টির ফলে বস্তুর গুণগত সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়। এই গুণগত ভাবটা আমাদিগকে অভিজ্ঞতা দ্বারা, অর্থাৎ দেখিয়া শুনিয়া, পড়িয়া লাভ করিতে হয়। এই গুণগত ভাব প্রত্যক্ষ সগুণ প্রকাশময় জগতে প্রত্যেক বস্তুতে সৌন্দর্য্যরূপে অবস্থিতি করে। কিন্তু জগতের কোন বস্তুই গুণহীন নহে, বস্তু মাত্রেরই কিছু না কিছু গুণ আছেই। এক্ষণে গুণই যদি বস্তুর সৌন্দর্য্য হয়, তাহা হইলে সগুণ প্রকাশময় জগতের সকল বস্তুই সুন্দর। কোন বস্তুই সৌন্দর্য্যবিহীন হইতে পারে না। কিন্তু বস্তুসমূহের গুণগত সৌন্দর্য্যের পরস্পর উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট ভেদে আপেক্ষিক ভেদ আছে। ভেদ আছে বলিয়াই আমরা নিকৃষ্টকে ত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্টকে গ্রহণ করিতে পারিতেছি। এই ভেদ না থাকিলে আমরা উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টের বিচার করিতাম কি লইয়া। এক্ষণে দেখা যাউক যে, বস্তুর আপেক্ষিক নিকৃষ্টতা বা সৌন্দর্য্যহীনতার মূল কোথায়? ইহার মূল হইতেছে উৎকৃষ্টের কাছে। কোন বস্তুর নিকৃষ্টতার প্রমাণ করিতে হইলে, তাহার কাছে একটা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু ধরা চাই; তাহা যদি না ধরা যায়, তাহা হইলে তাহার আর নিকৃষ্টত্বের প্রমাণ করা গেল না।

সুতরাং তাহার যে ভাবের যতটুকু গুণ থাকুক তাহাই তাহার সৌন্দর্য্যের প্রমাণ করে। সুতরাং এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, এই জগদ্ব্যাপী নিরাকার সাকার বস্তুসমূহ ও বুদ্ধি বিদ্যাগত বিষয়সমূহ স্ব স্ব পক্ষে অন্যের নিরপেক্ষ ভাবে সকলই সৌন্দর্য্যময় এবং এই সৌন্দর্য্যময় জগতের সৃষ্টি, রক্ষা ও পালনকর্ত্তা যিনি তিনি পরম সুন্দর। এক্ষণে বিষয় জগতের সমুদয় বস্তুকে আমরা সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না কেন, তাহাই বিবেচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ বিষয় জগতের সমুদয় বস্তুর রূপ, গুণ, ক্রিয়া আমাদের বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয় বটে, কিন্তু মানববুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র ও সসীম; অনন্ত বিষয়রাশির গুণ গ্রহণ করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য গ্রহণ করা মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, আবার যে সমুদয় বিষয়কে জানিয়া চিনিয়া আমরা বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করিয়াছি, তাহার মধ্যেও সকলগুলির প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া গুণ গ্রহণ করিতে পারা যায় না। পারা যায় না এই-জন্য, আমাদের বুদ্ধিগত সংস্কারের অনভিজ্ঞতামূলক অসম্পূর্ণতা-জনিত অজ্ঞানতার আবরণ সম্মুখে থাকে বলিয়া। মানব যতই বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভূষিত হউক, সকল বিষয়ে সমান অভিজ্ঞতা লাভ করা তাহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। সুতরাং যে বিষয়ে যাঁহার ভাল অভিজ্ঞতা আছে, তিনি সেই বিষয়ের সৌন্দর্য্য গ্রহণে অধিক সমর্থ। আর যে বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা নাই, সে বিষয়ের সৌন্দর্য্য-কদর্য্যের বিচার তিনি করিতে পারেন না। এই সৌন্দর্য্য গ্রহণের আর একটী বাধা এই যে, মানব তাহার ব্যক্তিগত সুখের হানি-জনকরূপে যে বিষয়কে স্থির নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছে অর্থাৎ যে

বিষয়ে তাহার বিদ্বেষ জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা ভুলক্রমেই হউক, আর অভ্যাস দোষেই হউক, সে তাহাকে সতত ঘৃণা ও উপেক্ষার চক্ষে দেখে বলিয়া তাহার সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না। ইহা ভিন্ন চিরপোষিত ভ্রান্ত কুসংস্কার সৌন্দর্য্য গ্রহণের বাধা জন্মায়। বস্তু মাত্রেরই সৌন্দর্য্য আমরা দুই প্রকারে গ্রহণ করি; প্রথম, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভব দ্বারা; দ্বিতীয়, আমাদের বুদ্ধিগত বিচারলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা। আমাদের আত্মা জ্ঞাতারূপে দেহের সর্ব্বময় কর্ত্তা। বুদ্ধি যেন তাহার অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারী। বুদ্ধি বিষয়সমূহের সৌন্দর্য্য কদর্য্য অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া আত্মার নিকট উপস্থিত করে; আত্মা তাহার অভিজ্ঞতালব্ধ বিবেক দ্বারা বিচার করিয়া বিষয়ের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য সম্ভোগ করে। আত্মা কখনই অপকৃষ্ট মাধুর্য্যহীন বিষয় চায় না। সে সর্ব্বদাই সৌন্দর্য্যের অনুসরণ করে। রমণীর রূপগত সৌন্দর্য্য দেখিবামাত্রই অনুভূত হইল। কিন্তু ইহা তাহার স্থূল সাকার সৌন্দর্য্য; ইহা ভিন্ন তাহার নিরাকার সৌন্দর্য্য যাহা আছে, তাহা আমরা অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞানযোগে গ্রহণ করি, যেমন রমণীর সতীত্বরূপ সৌন্দর্য্য। পরম সুন্দরী রমণী যদি ব্যভিচারিণী হন, তাহা হইলে জ্ঞানীর চক্ষে তিনি ঘৃণিত ও উপেক্ষিত। তাঁহার ঐ সাকার সৌন্দর্য্যের কোন মূল্য থাকে না। তিনি যদি পতি-পরায়ণা ও পুত্রবতী হন, তাহা হইলে রূপে কুৎসিতা হইলেও তাঁহার গুণগত নিরাকার সৌন্দর্য্যে আমরা পরিতৃপ্ত হই। সুতরাং শেষোক্ত নিরাকার সৌন্দর্য্য হইতেছে, বস্তুর গুণ ক্রিয়া-মূলক প্রভাবগত সৌন্দর্য্য। ইহা আমরা অভিজ্ঞতা ব্যতীত গ্রহণ করিতে পারি না। সর্প বিষের নাম শুনিলে গা শিহরিয়া

উঠে। ঈশ্বর কি উহাতেও সৌন্দর্য্য দিয়াছেন? নিশ্চয়ই দিয়াছেন, জগতের যখন স্ব স্ব পক্ষে নিরপেক্ষ ভাবে সকলই সুন্দর ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, তখন উহারও সৌন্দর্য্য আছে। সর্পদষ্ট ব্যক্তির সর্পবিষ কর্ত্তৃক আশু প্রাণ বিনষ্ট হয়; ইহা যেমন ইহার অসৌন্দর্য্য বা অপকৃষ্টতা, আবার স্থলবিশেষে মানবের আশু প্রাণ রক্ষা করে; ইহাই তাহার সৌন্দর্য্য ও উৎকৃষ্টত্ব। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে দেখিতে পাওয়া যায়, সর্পবিষঘটিত সূচিকাভরণাদি ঔষধ মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ রক্ষা করে। হোমিওপ্যাথিক মতে ল্যাকেসিস, কোব্রা প্রভৃতি সর্পবিষঘটিত ঔষধ ঐরূপ খুব কঠিন ভয়ানক অবস্থাপন্ন রোগীকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। সুতরাং ইহার এই গুণগত সৌন্দর্য্য কতদূর আদরণীয়, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু অভিজ্ঞতা ব্যতীত এই সৌন্দর্য্য গ্রহণ করা যায় না। ঐরূপ কর্পূর সুগন্ধি দ্রব্য, ইহা তাহার বাহ্য সৌন্দর্য্য; কিন্তু কর্পূর বিসূচিকা রোগনিবারক ও প্রতিষেধক; ইহা তাহার গুণগত সৌন্দর্য্য। মৃগনাভি উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য, উহা আবার হিমাঙ্গ অবস্থার রোগীকে শারীরিক উত্তাপ প্রদানে জীবন রক্ষা করে। এই সমুদয় বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ না করিলে ঐ ঐ বস্তুর সৌন্দর্য্য জানা যায় না। অতএব বিষয় জগতের সকলই সুন্দর, এই বিশ্বাসে উপনীত হইতে হইলে আপনার বুদ্ধিগত ভ্রম, কুসংস্কার, বিদ্বেষ, মলিনতা দূর করিয়া আত্মাকে নির্ম্মল রাখিতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব বিষয় জগতের গুণক্রিয়ায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। তাহা হইলে এই বিশ্বসংসার সমুদয় সুন্দর বলিয়া অনুভূত হইবে।

শাস্ত্রকারেরা জগতের বিচিত্রতা ও শিল্পনিপুণতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক বিশ্ব শিল্পীর অসীম গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছেন এবং জড়-জগতের সর্ব্বত্রব্যাপী বিচিত্রতার সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু নিরাকার সৌন্দর্য্যকে তাদৃশ লোকচক্ষে ফুটাইয়া তুলেন নাই; সেইজন্য মানব-জীবনে আমরা ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য গ্রহণে স্থূলদর্শী হইয়া পড়িয়াছি। মানবাত্মায় প্রকাশিত তাঁহার যে উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য; তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।

কিন্তু আমাদিগকে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে, মানবীয় নিরাকার সৌন্দর্য্যকে জীবনের আদর্শ করিয়া লইতে হইবে। আমাদের শারীরিক বর্ণগত ও আকার প্রকারগত বাহ্য স্বরূপ; যাহা আমরা জন্মের সঙ্গে পাইয়াছি, তাহা অবশ্য অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু আমাদের চরিত্রগত ভাব যাহা, যাহা আমরা চেষ্টা করিলে পরিবর্ত্তন করিতে পারি, সেই চরিত্রগত সৌন্দর্য্য লাভের জন্য, মানবীয় সৌন্দর্য্যকে আদর্শ করিয়া লইতে হইবে। সেই পরম সুন্দরের আদেশ পালনের জন্য আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্র, যাহাতে লোকচক্ষে ও তাঁহার চক্ষে সুন্দর দেখায়, সর্ব্বপ্রযত্নে সেই চেষ্টা করিতে হইবে। যথা, সাধুর সাধুতারূপ সৎপ্রেম, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, কর্ম্মীর কর্ম্ম-নিপুণতা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা। অভাবগ্রস্তের প্রার্থনা-পরায়ণতা ও ঐকান্তিক চেষ্টা, অনুতপ্তের পাপ বোধ, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, বাগ্মীর বাক্‌পটুতা, বিপন্নের ধৈর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কর্ত্তব্যপরায়ণের স্বার্থত্যাগ, প্রেমিকের প্রেমভক্তি ও ভালবাসা, দয়াবানের দয়া, শান্তচিত্তের ধীরতা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও সতর্কতা,

এই সমুদয় মানবীয় নিরাকার সৌন্দর্য্য জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এই মানবরূপ দেহ-যন্ত্রের মধ্য দিয়া তিনিই এই সমুদয় সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিতেছেন। অতএব এই সমুদয় আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, সেই পরম সুন্দরের আদেশ পালন করিতে হইলে, আমাদিগকে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদিগকে বাক্য, কার্য্য, চিন্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার ইত্যাদি সকল বিষয়েই সৌন্দর্য্যের অনুসরণ করিতে হইবে। আত্মরক্ষা ও কর্ত্তব্যের অনুরোধ ব্যতীত কাহারও দোষ ভাগ গ্রহণ করিবে না, সকল বস্তুর গুণগ্রাহী হইতে হইবে। তাহা হইলে এই জগৎ সমুদয়ই সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে পূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে। তাই প্রাচীন ঋষি মন্ত্র রচনা করিয়াছেন "মধুবাতা ঋতয়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবা, মধুমাং পার্থিব রজঃ ইত্যাদি অর্থাৎ বায়ুরাশি মধুময় হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, সমুদ্রের জলরাশি মধুময়রূপে নানা প্রকারে প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবীস্থ ধূলিকণা সমূহও মধুময় হইয়াছে ইত্যাদি। এই মন্ত্রটীর ভাবার্থ গ্রহণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন ঋষিয়া দৃশ্য জগতের সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিয়া সেই পরম সুন্দরের স্বরূপতত্ত্ব নিরূপণপূর্ব্বক তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। আমাদের এই দেহ আত্মার বাসস্থান অর্থাৎ বাসগৃহ স্বরূপ। অতএব অন্তরের উৎকর্ষতা সাধনপূর্ব্বক যেমন উন্নত চরিত্র লাভে যত্নবান হইতে হইবে, সেইরূপ ভগবানের মন্দির স্বরূপ আমাদের এই দেহের বাহ্য সৌন্দর্য্যও রক্ষা করিতে হইবে। ছাই ভস্ম মাখিয়া বসিয়া থাকিলে জ্ঞানীর চক্ষে সাধু হওয়া যায় না। প্রকৃত জ্ঞানী যিনি, তিনি একখানি মলিন

বসন পরিধান করাকেও অপরাধ বলিয়া মনে করেন। অতএব অশন, বসন, দেহ, গৃহ ও অন্তঃকরণ এবং আপনার চরিত্রের সকল দিকেই সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া সেই পরম সুন্দরের সাধন করিতে হইবে। এক্ষণে আইস পাঠক! আমরা সর্ব্বাঙ্গীন্ সৌন্দর্য্য লাভের জন্য সেই পরম সুন্দরের নিকট ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করি।

প্রার্থনা।

হে সুন্দরং! আমরা যেন জলে, স্থলে, শূন্যে, সাকারে, নিরাকারে, নূতনে, পুরাতনে, সমুদয় বিদ্যা-বুদ্ধিগত ব্যাপারে, আমাদের বাক্যে, কার্য্যে, চিন্তায় তোমার সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া কৃতার্থ হই। তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। হে পরম শোভাময় জগৎকর্ত্তা! আমরা যেন তোমার অসীম সৌন্দর্য্যকে হৃদয়ের আদর্শ করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন্ সৌন্দর্য্য লাভ করিতে পারি। হে মহিমার্ণব! আমরা কিরূপ হইলে তোমার দৃষ্টিতে সুন্দর হইতে পারিব, তাহা ভাল বুঝিতে পারি না; অতএব এই ভ্রমান্ধ স্বল্পবুদ্ধি জীব যাহাতে সুন্দর হইতে পারে, তুমি সেই পথে লইয়া চল। আমরা যেন কেবলমাত্র বেশভূষা অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া সৌন্দর্য্যের অভিমান না করি। যাহাতে আমরা চরিত্রগত সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া তোমার সমীপস্থ হইতে পারি, আমাদিগকে সেই সুযোগ প্রদান কর। হে প্রভু! তোমার এই সংসাররূপ অভিনয় ক্ষেত্রে তোমার অনন্তলীলার সহযোগীরূপ সুন্দর, অসুন্দর, উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট বিষয়সমূহ সকলেই তোমার সৌন্দর্য্যের মহিমাই ব্যক্ত করিতেছে।

অতএব হে পরম পিতা! আমরা যেন অসুন্দর ও অপকৃষ্টকে

সুন্দরের প্রতিপোষকরূপে সুন্দর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া সকল-কেই সুন্দর করিয়া লইতে পারি, তুমি আমাদিগকে এইরূপ বুদ্ধিশক্তি প্রদান কর। আমরা প্রত্যেক বস্তুর সৌন্দর্য্য গ্রহণ-কালে যেন তোমাকে স্মরণ রাখিতে পারি। তোমাকে হারাইয়া দীপালোকে পতঙ্গ পতনের ন্যায় সৌন্দর্য্যসাগরে যেন প্রাণ বিসর্জ্জন না করি। সকল সৌন্দর্য্যই যে তোমার অভিব্যক্তি, ইহা যেন আমাদের স্মরণ থাকে। আমরা যাহাতে দৈহিক, মানসিক ও চরিত্রগত সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া এবং তোমার বিচিত্র লীলাময় বিশ্বের সমুদয় বস্তু হইতে তোমার সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিয়া তোমার সৌন্দর্য্যের মহিমা ব্যক্ত করিতে পারি, তুমি আমাদিগকে সেইরূপ সুযোগ ও সুমতি প্রদান কর। আমাদের বাক্য, কার্য্য, চিন্তা ও ব্যবহার যেন আমাদের ব্যক্তিগত সৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রদান না করিয়া তোমার সৌন্দর্য্যই ব্যক্ত করে। আমরা যেন তোমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তোমার প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া এই জীবনলীলা সাঙ্গ করিতে পারি, ইহাই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

স্বরূপতত্ত্ব।

আনন্দরূপ-অমৃতং—তিনি আনন্দময়, তাঁহার কোন অবস্থায় নিরানন্দ বা বিষণ্ণতা নাই। কারণ তিনি অমৃত স্বরূপ। এই মরণশীল জগতে জীবসমূহ আনন্দ সম্ভোগ করে, আবার নিরানন্দ হয়। ইহার কারণ এই যে, তাহারা বিনাশশীল। কিন্তু যাঁহার মৃত্যু নাই, ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই তাঁহার নিরানন্দ হইবার কোন কারণ নাই; তিনি নিত্যানন্দময়। তাঁহার আনন্দরাশি বায়ু-রাশির ন্যায়, আকাশের ন্যায় সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই

আনন্দরাশি হইতে আনন্দ কণিকা গ্রহণ করিয়া জীবজগৎ বিবিধ প্রকারে স্ব স্ব স্বাধীনরূপে আনন্দ সম্ভোগ করে। শিশু তিন মাস অতিক্রম করিলে হাসিতে শিখে, এ হাসি এই আনন্দের অভিব্যক্তি তাহার কোথা হইতে আসিল, কে তাহাকে শিখাইয়া দিলেন, সে কোথায় এই আনন্দ পাইল? গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সে সেই পরমানন্দময়ের আনন্দ সমুদ্রে ডুবিয়াছিল। কিন্তু তাহার দেহযন্ত্রের বিকাশ না হওয়াতে সেই আনন্দ ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। এক্ষণে দেহ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে আনন্দের বিকাশ হইয়া শিশু আপনা আপনিই হাস্য করিতেছে এবং আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে, "আমি আনন্দ সহযোগে উৎপন্ন হইয়া আনন্দ সমুদ্রে অবস্থিতি করিতেছিলাম। এইরূপ সমুদয় জীব সেই আনন্দময়ের সর্ব্বব্যাপী আনন্দসাগরে সন্তরণ করিতেছে। সুতরাং জীব মাত্রেরই আনন্দ স্বাভাবিক ভাবে আছে। তন্মধ্যে অস্বাভাবিক ভাবমূলক দুঃখ, অতৃপ্তি যাহা জগতে নিয়তই ঘটিতেছে, তাহাই আমাদের চক্ষে পতিত হয় বলিয়া উহাকে আমরা বড় করিয়া দেখি। কিন্তু আমরা যে প্রতিনিয়ত সর্ব্বপ্রকারে আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি, উহা আমাদের অভ্যাসগত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমরা উহা দেখিতে পাই না। যদি আমরা উহা দেখিতে পাইতাম অর্থাৎ সেই আনন্দময়ের আনন্দ সমুদ্র হইতে আমরা প্রতিনিয়ত আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি, ইহা যদি আমাদের স্মরণ থাকিত, তাহা হইলে আমরা সেই আনন্দময়কে ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। তিনি আমাদের অন্তর্জগৎ, বহির্জগৎ সমুদয়ই তাঁহার আনন্দরাশিতে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা

উৎকৃষ্ট দৃশ্য দর্শনে আনন্দ পাইতেছি, উৎকৃষ্ট শব্দ শ্রবণে, উৎকৃষ্ট আঘ্রাণে, উৎকৃষ্ট স্বাদ গ্রহণে, উৎকৃষ্ট সুকোমল স্পর্শে আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি এবং যখন ইন্দ্রিয়দিগের কার্য্য স্থগিত থাকে, তখনও উৎকৃষ্ট বিষয় চিন্তা দ্বারা আনন্দ সম্ভোগ করি। এই দৃশ্যজগৎ সকলই আনন্দময়। আমার তোমার নিকট যাহা নিরানন্দজনক, অন্যের নিকট তাহা আনন্দদায়ক। দেশকাল অবস্থার পরিবর্ত্তনে বস্তু সকল কখন কখন আমাদের নিকট আনন্দদায়ক না হইলেও সে যে নিরপেক্ষ ভাবে আনন্দময়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ দৃশ্যমান জগৎ সমুদয়ই সেই নিত্যানন্দময়ের স্বরূপের অভিব্যক্তি; এইজন্য আনন্দময়। অতএব সেই অমৃতস্বরূপ নিত্যানন্দকে আদর্শ করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করা কর্ত্তব্য।

আনন্দ সম্ভোগের সম্প্রদায় বিশেষের ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন মতাবলম্বীরা হঠযোগাদি বিবিধ শারীরিক প্রক্রিয়া দ্বারা আনন্দ লাভ করেন। কোন কোন সম্প্রদায় সংসার ত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জনে আনন্দময়ের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন। কিন্তু ঐ সমুদয় আনন্দ উপভোগ যে কি প্রকারে হয়, তাহা তাঁহারাই জানেন। ঐ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতাও নাই। আমরা ঐ সমুদয় মতের পক্ষপাতীও নহি। সুতরাং উহা লইয়া আলোচনা বৃথা।

আমরা অনুসন্ধান করিব যে, এই কর্ম্মময় সংসারে থাকিয়া কিরূপে সেই আনন্দময়ের সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করা যায়। প্রথমতঃ দেখা যাউক, সংসারে থাকিয়া পরমানন্দ লাভ করা সম্ভব কি না? আমি বলি সম্ভব; সংসারই যখন সেই

আনন্দময়ের লীলাভূমি; তখন এইখানেই তাঁহার আদেশ পালনের উপযুক্ত সুযোগ রহিয়াছে। মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মানব সাধারণতঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ; এবং মন এই একাদশটী ইন্দ্রিয় দ্বারা আনন্দ সম্ভোগ করে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, সে এই আনন্দ সম্ভোগ পরিমিতভাবে বিবেকের অধীন হইয়া করে কি না। যদি তাহা করে, তাহা হইলে সে প্রকৃত মানুষ; তাহার নিরানন্দ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার কারণ এই যে, সে যে আনন্দ সম্ভোগ করে, তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বিবেকের অধীন হইয়াই করে; তাহার ব্যক্তিগত সুখের উদ্দেশে করে না। এইজন্য তাহার অপরাধও নাই, নিরানন্দও নাই। সে মনুষ্য হইয়াও স্বর্গবাসী দেবতার ন্যায় সংসারে থাকিয়াই পরমানন্দ লাভ করে। আর যদি বিবেকের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া নীচ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া ইন্দ্রিয় লালসা নিবারণের জন্য অপরিমিত আনন্দ সম্ভোগ করে, তাহা হইলে সে মানুষ হইয়াও পশু অপেক্ষা অধম। কারণ পশুরা স্বভাবসিদ্ধ নিয়মের বশীভূত, কিন্তু মানুস স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া অসদাচরণ করিতে পারে। সুতরাং সেইরূপ নরপশুর অপরিমিত, উদ্দেশ্যবিহীন বিবেকের অননুমোদিত আনন্দ সম্ভোগে, নিরানন্দরূপ দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য। কথাটা তুলনা দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। পূর্ব্বোক্ত সকল ইন্দ্রিয় দ্বারেই উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া অপরিমিত আনন্দ সম্ভোগ করিলে তজ্জনিত অপরাধের শাস্তি ভোগ করিতে হয়। তন্মধ্যে

মানবের উপস্থ নামক ইন্দ্রিয় অর্থাৎ জননেন্দ্রিয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রলোভনযুক্ত ও বিপদসঙ্কুল। ইহাতেই অপরিমিত আনন্দ সম্ভোগ করিতে যাইয়া মানুষ ধনে প্রাণে নষ্ট হয়। আজকাল পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে অধিকাংশ থাইসিস্ অর্থাৎ যক্ষ্মা রোগী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে আমার বিশ্বাস যে, ঐ রোগ সংক্রামকভাবে আমাদের দেশে আসে নাই। ইহার কারণ হইতেছে, বর্ত্তমান সভ্যতা ও ভোগবিলাসের যুগে, মানবের মনে ধর্ম্মভাবের অভাব হওয়ায়, অপরিমিত ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা বৃত্তি প্রবল হইয়াছে বলিয়া। তাহারই ফলস্বরূপ অপরিমিত শুক্রক্ষয়-জনিত যক্ষ্মারোগ, ধ্বজভঙ্গ, স্পার্মেটেরিয়া ও গণোরিয়া এবং উপদংশ আদি দূষিত ব্যাধি সমধিক প্রাবল্য লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, তিনি যে মানবকে ভালবাসেন; তবে কেন এই ইন্দ্রিয় দ্বারে এত প্রলোভন দিয়া তাঁহার প্রিয় সন্তানগণকে এরূপ বিপদাপন্ন করিলেন। কিন্তু ইহা সেই বিশ্বশিল্পীর বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্যের ফল। যদি তিনি জননেন্দ্রিয় দ্বারকে এরূপ প্রলোভনযুক্ত না করিতেন, তাহা হইলে ঘৃণিত মল মূত্রদ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া কেহ তাঁহার জীব-প্রবাহ রক্ষার উদ্দেশ্য সফল করিতে যাইত না। ঐ প্রলোভন দিয়াছেন বলিয়া উহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবারও উপায় করিয়া দিয়াছেন। উপায় এই যে, মানবকে জ্ঞান বিবেকের অধিকারী করিয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এই দুর্দ্দম্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে মানব বিবেকবলে শাসনে রাখিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করতঃ পরিমিত আনন্দ সম্ভোগ করিবে; কিন্তু আমরা তাহা পারিতেছি না। তজ্জন্য আমরা অপরাধের শাস্তিস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত

বিবিধ রোগ ভোগ করিতেছি। আমরা যদি ইন্দ্রিয়গুলিকে বিবেকের অধীনে রাখিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলিকে দমনপূর্ব্বক পরিমিত ভাবে সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বারে সুখ সম্ভোগ করিতে পারি, তাহা হইলে কোন প্রকার শাস্তিভোগ করিতে হয় না। অতএব সংসারে থাকিয়া সেই আনন্দময়ের সাধন করিয়া, সকল প্রকার আনন্দ তাঁহার জ্ঞান স্বরূপের অধীন হইয়া সম্ভোগ করাই মানবের কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর নিরানন্দরূপ বিষণ্নতা ও দুঃখের ভাগী হইতে হইবে না। অতএব দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, মনন, আহার, বিহার, শয়ন, গমন, গ্রহণ, বর্জ্জন ইত্যাদি সকল প্রকার কর্ম্মগত অবস্থায় সতর্কতার সহিত বিবেকের অধীন হইয়া সেই পরমানন্দ-ময়ের প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া, পরিমিত ভাবে আনন্দ সম্ভোগ করা কর্ত্তব্য।

প্রার্থনা।

হে আনন্দময়, অমৃতস্বরূপ! আমরা যেন বিশ্ব সংসারের সকল বস্তুকেই তোমার আনন্দ স্বরূপের প্রকাশ জানিয়া তোমাকে অনুসরণপূর্ব্বক আনন্দিত হই। এইরূপ জ্ঞানালোক আমাদিগকে প্রদান কর। আমরা যেন ঘৃণিত নীচ প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সুখ সাধনের উদ্দেশে আনন্দ সম্ভোগ করিতে যাইয়া তোমাকে ভুলিয়া না যাই, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। আমরা যেন ব্যক্তিগত আনন্দ সম্ভোগেচ্ছাকে তোমার ইচ্ছার অধীন করিয়া, তোমার পরমানন্দ লাভে কৃতার্থ হই। আমরা যেন আপাত প্রীতিকর, পরিণাম বিরস বিবিধ ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ করিতে যাইয়া মৃত্যুকে আহ্বান না করি, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার এই বিচিত্র

জগতের বিবিধ প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য জ্ঞান ও শক্তি আমাদিগকে প্রদান কর। আমরা যেন ঘৃণিত নীচ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া তুচ্ছ আনন্দ সম্ভোগ করিতে যাইয়া তোমাকে বঞ্চিত না হই, তুমি আমাদিগকে এইরূপ সাবধানতা বৃত্তি প্রদান করিয়া মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা কর। আমরা যেন সর্ব্বদা জ্ঞানযোগে অবস্থিতি করিয়া তোমার উদ্দেশ্যে লক্ষ্য রাখিয়া পরিমিত ভাবে আনন্দ সম্ভোগ করি।

স্বরূপ তত্ত্ব।

প্রেমময়ং—প্রেম অর্থে সাধারণ ভাষায় ভালবাসা বা অনুরাগ; টান বা আকর্ষণ শক্তিবিশেষ। যে যাহাকে ভালবাসে, তাহার উপর তাহার একটা টান বা আকর্ষণ শক্তি আছে। সে সেই শক্তির বলে প্রেম পাত্রের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহাই হইল প্রেমের লক্ষণ। মানবীয় প্রেমের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যেমন পতি-পত্নীর পরস্পর ভালবাসা, যাহাকে বলে দাম্পত্য প্রেম, পুত্র কন্যার প্রতি পিতা মাতার অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ স্নেহ মমতা ও প্রাণপণ ভালবাসা, গুরু শিষ্যের পরস্পর সেবা ভক্তি স্নেহ, পিতা মাতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভর এই সমুদয় মানবীয় প্রেমের কার্য্য। এই প্রেমের বিকাশ অন্যান্য ইতর প্রাণীর মধ্যেও যথেষ্টরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে অপত্য স্নেহ, মণ্ডলীবদ্ধতা, দাম্পত্য মিলন, প্রভুভক্তি ইত্যাদি প্রেমের কার্য্যকারিতা সচরাচর দেখা যায়। জড় পদার্থদিগের মধ্যেও আকর্ষনী শক্তি দেখিয়া প্রেম-লীলার পরিচয় পাওয়া যায়। নভোমণ্ডলে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি পরস্পরের আকর্ষণের বলে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথে

নিয়মিতরূপে পরিভ্রমণ করতঃ সেই অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমলীলার মহিমা ব্যক্ত করিতেছে। আধুনিক পণ্ডিতেরা উদ্ভিদ্‌দিগের সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে উহাদের মধ্যেও প্রেমলীলার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই সমস্ত বাহ্যজগতে খণ্ডভাবে প্রেম বিস্তারের দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুমান করা যাইতেছে যে, সেই অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমলীলা, অবিচ্ছিন্নরূপে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। সেই প্রেম-সমুদ্রে জীবসমূহ সন্তরণ করিতেছে। পিতা মাতা, সন্তানের অপ্রার্থনা স্বত্বেও তাহাদিগকে আপনা আপনি প্রাণপণ ভালবাসিতেছেন; এই নিঃস্বার্থ ভালবাসার মূল হইতেছে, পরস্পরের স্বাভাবিক প্রেমের বন্ধন। উহাকে টান বা আকর্ষণী শক্তি বলা যাইতে পারে। ইহা মানব আপন ইচ্ছায় বা বুদ্ধিবলে সৃজন করে নাই; ইহা সেই প্রেমময়েরই প্রেমলীলা। বিশ্বব্যাপী অচেতন, সচেতন, সাকার, নিরাকার সমুদয় বস্তুই তাঁহার প্রেমের বন্ধনে রক্ষিত, ধৃত ও পরিচালিত। মানব প্রকৃতিতে, ইতর প্রাণীতে ও বাহ্যজগতে তাঁহার এই প্রেমলীলা দেখিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, তিনি প্রেমময়, প্রেম তাঁহার স্বরূপ। তিনি তাঁহার এই লীলার জন্য বিশ্বকে অতিশয় ভালবাসেন; এ ভালবাসা তাঁহার দরকার, এরূপ ভাল না বাসিলে তাঁহার চলে না, তাঁহার লীলা হয় না। তাঁহার এই প্রেমের বিকাশরূপী ভালবাসাতে কোন স্থলে কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। তিনি শত্রু, মিত্র, দ্বেষ্য, সম্মত, স্তাবক, নিন্দুক, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক সকলকেই সমান ভালবাসেন। বিস্তৃত বায়ুরাশি যেমন সকল জীবের প্রাণরক্ষার সহায়তা করিতেছে, তাঁহার ভালবাসা ঐরূপ বিস্তৃত ও পক্ষপাত শূন্য।

এই সমুদয় আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারা গেল, তিনি স্বভাবতঃই জগতকে ভালবাসেন, ভালবাসাই তাঁহার প্রকৃতি। এই জন্যই তাঁহার স্বরূপগত নাম রাখা হইয়াছে "প্রেমময়ং"। তাঁহার এই ভালবাসা সাধারণ ভাবে সর্ব্বব্যাপী হইলেও প্রকাশে বিশিষ্টতা আছে। মানবকে তিনি স্বীয় অনন্ত জ্ঞানের কণিকামাত্র প্রদান করিয়া তৎসহ কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দানে উন্নতিশীল করিয়াছেন; ইহাতেই তাঁহার মানবের প্রতি অপার করুণার ফলস্বরূপ ভালবাসার বিশিষ্টতা দেখা যাইতেছে। ইহাতেই মনে হয়, তিনি তাঁহার ইতর প্রাণী ও জড়পদার্থে, স্বভাবসিদ্ধ ও নিয়মিতরূপে প্রেম স্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে জগতে ছাড়িয়া দিয়া, মানবকে কোলে তুলিয়া তাঁহার অজস্র প্রেমের দ্বারা মুখ চুম্বন করিতেছেন। তিনিই পিতৃমাতৃরূপে প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আমাদিগকে উৎপাদন পূর্ব্বক অপত্য স্নেহরূপ প্রেমধারা প্রবাহিত করিয়া প্রতিপালন ও রক্ষণ করিতেছেন। তিনিই শিক্ষক, গুরুর বেশে উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগকে প্রেমশিক্ষা দান করিতেছেন। তিনিই রাজকীয় বিচারকরূপে, সামাজিক দণ্ডরূপে, রোগ, শোক দুঃখরূপে আমাদিগকে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘনরূপ অপরাধের শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক শিক্ষাদান করতঃ সৎপথে লইয়া যাইয়া তাঁহার অসামান্য ভালবাসার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। আমাদের দেহ রক্ষার জন্য অসংখ্য প্রকার খাদ্য, পানীয়, বিশুদ্ধ বায়ু ও পরিধেয় অনবরত যোগাইতেছেন। তিনি আমাদের বিবেকরূপে অন্তরে থাকিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দমন পূর্ব্বক সৎকার্য্যে উৎসাহ দানে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছেন। তিনিই আমাদের অন্তঃকরণে ভক্তি, স্নেহ, দয়া, ক্ষমা, উপচিকীর্ষা বৃত্তি প্রদান করিয়া তাঁহার

অনন্ত প্রেমলীলা সম্পাদন করিতেছেন। এইরূপ সর্ব্ব কার্য্যে, সকল স্থলেই, তাঁহার প্রেমের বিকাশরূপ ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

কিন্তু আমরা এমনই হতভাগ্য যে, এমন হিতৈষী পরম বন্ধুকে আদৌ চিনিতে পারিতেছি না। তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে, তাঁহাকে প্রকৃতরূপে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে, তাঁহার এই সর্ব্বব্যাপী অবিচ্ছিন্ন নিঃস্বার্থ ভালবাসাকে হৃদয়ের আদর্শ করিয়া লইতে হইবে। তাঁহার কাছে শত্রু মিত্র ভেদ নাই। তিনি সকলকে সমান ভাল বাসেন। সুতরাং তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতে হইলে এই প্রকার ভালবাসার অনুকরণ করিতে হইবে। এই সাকার নিরাকার প্রত্যক্ষ জগৎ ও সমুদয় জীবজগৎ এবং আমাদের দেহ ও আত্মা এ সমুদয়ই সেই প্রেমসিন্ধুতে অভিষিক্ত রহিয়াছে; এইজন্য সকল বস্তুকেই ভালবাসার চক্ষে দেখিতে হইবে। মুখে কৃত্রিম ভালবাসিলে চলিবে না। একেবারে আন্তরিকভাবে প্রকৃতরূপে ভালবাসিতে হইবে। সাধকের যদি জগতে একটীমাত্রও সামান্য শত্রু থাকে, আর তাহাকে ঘৃণা বিদ্বেষের চক্ষে দেখা হয়, তাহা হইলে প্রেমময়ের সাধন হইল না; যেহেতু সেই সামান্য শত্রুটীও ঈশ্বরের প্রিয় অর্থাৎ ভালবাসার পাত্র। হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, নিন্দা ও পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি প্রেমবিরোধী শত্রুগণকে অন্তঃকরণ হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে হইবে। শত্রুকেও প্রাণের সহিত ভালবাসিতে হইবে। কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করিবে না। কদাচ রাজদ্রোহী ও গুরুদ্রোহী হইবে না। অপকারীর প্রত্যপকার করিবে না। পরের উন্নতি দেখিয়া দুঃখিত হইবে না বরং ঈশ্বরের অনুমোদিত বলিয়া সন্তুষ্ট হইতে হইবে। আত্মরক্ষার

অধিকার অতিক্রম করিয়া কোন জীবের প্রতি হিংসা প্রকাশ করিবে না। উপস্থিত বিষয়সমূহ জগতে যে ভাবেই প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই তাঁহার অভিলষিত ও প্রিয় জানিয়া সকলকেই ভক্তি ও স্নেহের চক্ষে দেখিতে হইবে। অপরিচিত, পরিচিত, সাধারণ মানবকুল তাঁহার প্রিয় সন্তান জানিয়া সকলের প্রতি ভ্রাতা-ভগ্নী ভাবে, পিতৃমাতৃ ভাবে, অবস্থা বিশেষে পুত্রকন্যা ভাবে প্রীতি, ভক্তি ও স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক সেই অনন্ত প্রেমময়ের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে। প্রতিবাসী, দাসদাসী, আত্মীয়স্বজন, স্বজাতি, বিজাতি, স্বদেশী, বিদেশী সকলের সহিত ভালবাসারূপ প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক প্রেমের বন্ধন সুদৃঢ় রাখিতে হইবে। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, যে ব্যক্তি শত্রুতা করিতেছে, যে বিদ্বেষ করিতেছে, যে উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য করিতেছে, যে কুৎসিৎ পাপীকে নিকটে আসিতে দিতে ঘৃণাবোধ হয়, যে হিংসা করিতে উদ্যত, তাহাদিগকে কিরূপে ভালবাসা যায়। ইহার একটী সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, কোন ব্যক্তির একমাত্র পুত্র যদি ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা থাকে কি না? পরন্তু, তাহার প্রতি পিতার আন্তরিক ভালবাসা নষ্ট হয় না। কারণ, পিতা সেই দুর্বিনীত পুত্রের প্রতি আশা করেন যে, সে সুশিক্ষা ও শাসনের প্রভাবে সংশোধিত হইয়া সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং অনেক স্থলে এরূপ আশা সফলও হইয়া থাকে।

অতএব অপরাধিগণকেও এইরূপ আন্তরিক স্নেহ ও ভালবাসার চক্ষে দেখিয়া তাহাদের প্রতি আশা ও বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা যে কোন অজ্ঞান

কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পীড়িত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে রাজদ্বারে বিচার-প্রার্থী হইতে হইবে না ; তাহাকে আদর করিতে হইবে, একথা বলা হইতেছে না। কারণ, অজ্ঞান অপরাধীকে তাহার অসদ্ব্যবহারের জন্য আদর করিলে তাহার অপরাধের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সে বুঝিতে পারিল না যে, অপরাধ করিয়াছে ; সুতরাং তাহাকে আদর করায় তাহার পাপের দ্বার উন্মুক্ত হইল।

কাযেই, এরূপ আদরকে বিদ্বেষ প্রকাশ বলা যাইতে পারে। অতএব ঐরূপ অপরাধীকে ভালবাসিতে হইবে, তাহার সুশিক্ষা ও শাসনের ব্যবস্থা করিয়া। সে যাহাতে পূর্ব্ব কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট চরিত্র লাভ করিতে পারে, সেই চেষ্টা করিতে হইবে। বধ করিতে উদ্যত কোন আততায়ীর আক্রমণে আপনার প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, তাহাকে হিংসা পূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে। ঘরে গোখুরা সাপ গিয়াছে, গ্রামে ব্যাঘ্র আসিয়াছে, এ সময় হিংসা ত্যাগ করিয়া ধার্ম্মিক হইতে যাওয়া দুর্ব্বলতা ও অকর্ম্মণ্যতার পরিচায়ক। এই অবস্থায় সর্প ও ব্যাঘ্রকে বিনষ্ট করিয়া ঈশ্বরের প্রিয় সন্তানগণের জীবন রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য। তাঁহার প্রেম লাভ করিতে হইলে, তাঁহার ভালবাসার পাত্র হইতে হইলে সর্ব্বপ্রকারে যাহাতে তাঁহার নিকট ভাল হওয়া যায়, কোন বিষয়ে কোন প্রকারে ক্রটী না হয়, সর্ব্বপ্রযত্নে সেই চেষ্টা করিতে হইবে। অন্তঃকরণের প্রেম-প্রবণবৃত্তিসমূহ যথা :—ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা, প্রভৃতি বৃত্তি যাহাতে উদ্দীপ্ত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এজন্য সর্ব্বদা জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

ঈশ্বর আমাদিগকে পিতামাতা বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি সমুদয় উপকারী ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। কিন্তু সেই ভালবাসা আমরা অভ্যাস দোষে কিছুতেই ধারণা করিতে পারি না। পিতামাতার স্নেহ ভালবাসার কথা যেমন শিশু পুত্র স্মরণ রাখিয়া ধারণা করিতে পারে না, ধর্ম্মচর্চ্চার অভাবজনিত অজ্ঞতার ফলে আমাদেরও সেইরূপ দশা ঘটে। শিশু নিজের সুখ স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত। তাহার কোন বিষয়ে অতৃপ্তি ঘটিলে পিতা-মাতাকে ভক্তি প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে প্রহার সুখ সম্ভোগ করিতে হয়। সেই শিশু ক্রমে বাল্যাবস্থায় পতিত হইলে তাহার যখন একটু জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তখন আর পিতামাতাকে তুমি ভিন্ন তুই বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। পরে যৌবনাবস্থায় পতিত ও শিক্ষিত হইলে, তখন পিতামাতাকে পরমোপকারী হিতৈষী বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে উপযুক্ত সেবা ভক্তি করিয়া থাকে। কিন্তু সেই শিশু যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও শিক্ষালাভ না করিয়া পিতামাতাকে চিনিতে না পারে ও উপযুক্ত সেবা ভক্তি না করে এবং তাহার সেই শৈশবীয় স্বভাব প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহাকে আর মানুষ বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। লোকে তখন তাহাকে নরপশু বা নরপিশাচ বলিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, সে শৈশবীয় অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া পিতামাতার প্রতি সেবা ভক্তি করিতে শিখিল না। কিন্তু পিতামাতা, ভ্রাতা ভগ্নী, জ্ঞাতি বন্ধু, আত্মীয়স্বজন যিনি যতই উপকারী হিতৈষী হউন, ইঁহারা যিনি যতই ভালবাসুন, ঈশ্বরের ভালবাসার সহিত তাহার তুলনা হয় না। ঐ সমুদয় ভালবাসা অল্পকাল স্থায়ী; উহা সেই অনন্ত প্রেমময়ের ব্যষ্টিভাবের খণ্ড প্রকাশ মাত্র। তিনি

সমষ্টিরূপে, ব্যাপ্তভাবে, বাহ্যজগতে ও ব্যষ্টিরূপে প্রত্যেক জীবে, বিশেষতঃ প্রত্যেক মানবে, তাঁহার অফুরন্ত প্রেমধারা নিয়তই ঢালিতেছেন। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের চিরসঙ্গীরূপে সর্ব্বদা সকল স্থানে আমাদিগকে ভালবাসিতেছেন। এই ভালবাসার প্রতিদানস্বরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্তি করা মানবের অতিশয় কর্ত্তব্য। এই ভক্তি আত্মা দ্বারা সাধন করিতে হইবে। কোন পার্থিব উপহার দ্বারা বা প্রতিনিধি দ্বারা ভক্তি সাধন হইতে পারে না। তাঁহার অসীম গুণরাশি এবং জগতের ও আমাদের প্রতি উপকারিতার বিষয় স্মরণ করিলে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যে ভাব উত্থিত হইবে, তদ্দ্বারা ভক্তি করিতে হইবে। এই ভাব ভক্তি কি প্রকারে উত্থিত হয়, তাহা পার্থিব ভক্তির তুলনা দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

আমরা পিতা, মাতা, শিক্ষক ও অন্যান্য গুরুজনদিগের কথা যখন স্মরণ করি, তখন আমাদের মনে তাঁহাদের নিঃস্বার্থ হিতৈষিতা ও ভালাবাসার কথা মনে হইয়া তাঁহাদের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব আপনি মনে উদয় হয়। তাঁহাদের ঐ গুণ যদি না থাকিত, তাহা হইলে কখনই তাঁহাদের প্রতি ভক্তি হইত না। ঐরূপ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি লাভের উপায় হইতেছে, তাঁহার গুণাবলী ও উপকারিতার বিষয় স্মরণ ও চিন্তা করা। তিনি অসীম করুণাময়, অসীম প্রেমময়, এই বিশ্বাস যদি আমরা দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি ভক্তি জন্মিবে। কিন্তু বিস্মৃতিশীল মানব-প্রকৃতি কোন বিশ্বাসকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ধরিয়া রাখিতে পারে না; সেইজন্য সাধন ভজনকে প্রণালীবদ্ধ করা হয়। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী ভক্ত যিনি, তিনি কোন নিয়মের

বাধ্য নহেন। তাঁহার ভক্তি হেতুশূন্য অর্থাৎ অহৈতুকী। আমরা কোন বিষয়ে উপকার প্রাপ্ত হইলে বা কোন অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি; কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত যিনি, তিনি উপকার অপকার দেখিয়া ভক্তি বিনিময় করেন না; তাঁহার ভক্তি স্বভাবতঃই ঈশ্বরমুখীন; তিনি তাঁহার বলিতে যাহা কিছু সমুদয়ই ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ভক্তির অঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। এখন তিনি সম্পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার করিয়া ভক্তির ফলস্বরূপ ঈশ্বর সেবায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। ইহাই প্রেমময়ের সাধনের উন্নত আদর্শ। এই ভক্তিতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে মানবের বহুকাল গত হইয়াছে। মানব আদিম বর্ব্বরাবস্থায় ঈশ্বরকে অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি যে তাঁহার প্রিয় সন্তান বলিয়া মানবকে অত্যন্ত ভালবাসেন অর্থাৎ তিনি যে প্রেমময়, ইহা তাঁহারা তখন বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই; এবং বুঝিবার সময় ও সুযোগ পান নাই। প্রাকৃতিক শক্তির তাড়নায়, জ্ঞানবিজ্ঞানের অভাবে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া সর্ব্বদা তাঁহারা ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিতেন এবং এইজন্য ঈশ্বরকে ভয়ানক যথেচ্ছাচারী বলিয়া কল্পনাপূর্ব্বক বিবিধ স্তব স্তুতি, পূজা অর্চ্চনা ও তৎসহ বিবিধ পার্থিব খাদ্যাদি দিয়া সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা মহামারী প্রভৃতি আকস্মিক দৈব দুর্ঘটনা দেখিয়া সাব্যস্ত করিতেন যে, ঈশ্বর ভয়ানক ক্রোধী, যথেচ্ছাচারী ও মনুষ্যরক্তপিপাসু। নতুবা অকস্মাৎ বহু লোকের প্রাণবিনাশ কি জন্য করেন। নিশ্চয়ই তাঁহার মনুষ্যরক্তের প্রতি লোভ রহিয়াছে; এইরূপ মীমাংসায় পৌঁছিয়া মানব স্বভাবসুলভ বুদ্ধিতে যথেচ্ছাচারী ও ক্রোধীকে

সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য উপায় আবিষ্কার করিলেন যে, তাঁহার দুর্জ্জয় শক্তির ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে আহ্বান করিয়া তাঁহার সম্মুখে স্তুতি মিনতি সহকারে পূজা অর্চ্চনাপূর্ব্বক, বিবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য, পানীয়, গন্ধদ্রব্য উপহার প্রদান ও সঙ্গে সঙ্গে রক্ত প্রদান করা। এইজন্যই নরবলি পশুবলির ব্যবস্থা করা হইল। যাঁহারা বিভীষিকা মূর্ত্তিধারিণী কালীর সম্মুখে পূজা উপহার ও রুধির প্রদান করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন আমার এ কথা কতদূর সত্য। এই সময়ে ভক্তিবৃত্তি মানব হৃদয়ে অস্ফুটভাবে নিদ্রিতাবস্থায় ছিল। মানব যে ঈশ্বরকে ভক্তি করিতেন·সে কেবল ভয়ের বশীভূত হইয়া; ঈশ্বরের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য; সুতরাং প্রকৃত ভক্তি তখনকার আমলে আবিষ্কৃত হয় নাই; এবং ঈশ্বরকে প্রেমময় বলিয়াও উপলব্ধি হয় নাই। সেইজন্য বলিদানের ব্যবস্থার ফলে মনুষ্য ও পশুরক্তে মেদিনী প্লাবিত হইতেছিল, এমন সময় বুদ্ধদেব নামক কোন :মহাপুরুষের মনে এই অনাবশ্যক জীবহিংসার প্রাবল্য দেখিয়া বড় আঘাত লাগিল। তিনি ঈশ্বরের ন্যায়পরতা ও মানবের কর্ম্মফল; এই দুইটী অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জীবহিংসা নিবারণ ও মানবকুলকে জ্ঞানের পথের পথিক করিবার জন্য অহিংসামূলক জ্ঞানপ্রধান ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তাহাতে মানবকুল জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য দলে দলে সংসার ত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জনবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। সংসার যে মানবের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র, সাধনক্ষেত্র এবং ঈশ্বর প্রেমময় এই সংসার তাঁহারই প্রেমলীলা; তিনি যে মানবকে ভালবাসেন,

এ সমুদয় তত্ত্ব তখন আবিষ্কৃত হয় নাই। তাই নবদ্বীপ হইতে চৈতন্যদেব মস্তকোত্তোলনপূর্ব্বক মানবদিগকে উপদেশ দিলেন যে, শুষ্ক নীরস জ্ঞানপ্রধান ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের ন্যায়পরতা লইয়া প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন হইবে না; শুষ্ক নীরস জ্ঞানকে প্রেম-ভক্তি দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া সরস করিয়া লইতে হইবে। ঈশ্বর কেবল ন্যায়পরায়ণ নহেন, তিনি প্রেমময়; তিনি আমাদিগকে ভাল-বাসেন। তিনি আদালতের হাকিমের মত হুকুম দিয়া বাসায় যান না; তিনি যদি কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে অপরাধীর সঙ্গে সঙ্গে কারাগারে গিয়া কারাকষ্ট সহ্য করিয়া তাহাকে রক্ষা করেন। অতএব ভাবভক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রেমময়ের সাধন করিতে হইবে। এইরূপে তিনি প্রেম-প্রধান ধর্ম্ম প্রচার করিয়া দেশকে মাতাইয়া তুলিলেন। তাঁহার শাখা সম্প্রদায় স্বরূপ কর্ত্তাভজা, কবিরপন্থী, দাদুপন্থী প্রভৃতি অসংখ্য সাম্প্রদায়িকগণ প্রেম-প্রধান ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহাতে যুগান্তর উপস্থিত হইল। যিনি ভয়ঙ্করী প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্য-দানবরূপ পাপীদিগকে সংহার করতঃ তাহাদের মুণ্ডমালা গলদেশে ধারণ করিয়া রণরঙ্গে নৃত্য করিতেছিলেন, তিনিই রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া পরম প্রেমময়ী, মানব হৃদয়ের পরমানন্দদায়িনী শ্রীমতী রাধিকা সাজিয়া ভক্তের প্রেম-ভক্তি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ভারতের ধর্ম্মভাব ভয় হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন প্রেমের ধর্ম্মে পরিণত হইল। সুতরাং এই প্রেম ও ভক্তি-প্রধান ধর্ম্মের মূল হইতেছে চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম। আমরা ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ এই ভক্তি তত্ত্বটা বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে উজ্জ্বলরূপে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

এজন্য আমরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। অজ্ঞান জীবের হিতসাধনের জন্য কিরূপে তাহাকে ভালবাসিয়া প্রেম শিক্ষা দিতে হয়, তাহা সেই চৈতন্যদেবই এদেশে প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী কীর্ত্তন গানে আছে, "মেরেছে কলসীর কাণা, তাই ব'লে কি প্রেম দিব না।" তিনি কোন সময় কোন অজ্ঞান দস্যু তস্করদিগের নিকট কীর্ত্তন গান করিতেছিলেন, সেই সময় কোন দস্যু কর্তৃক কলসীর কাণাদ্বারা প্রহৃত হইয়াও তাহার প্রতি অবিচলিত আশা ও বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক প্রেমের দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ইহাতে বৈদান্তিক ও তান্ত্রিক পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন যে, ভক্তিটা বহু পূর্ব্ব হইতেই আছে, উহা চৈতন্যদেব আবিষ্কার করেন নাই; তাহাতে আমি বলি যদি থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা সাধারণের পক্ষে ছিল না, তাহা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের জন্য লুক্কায়িত ভাবেই ছিল। সাধারণের ভক্তি ছিল চোর-ডাকাইতকে ভক্তি করার ন্যায় ভয়মূলক কৃত্রিম ভক্তি। আমরা যেমন দুর্দ্দান্ত চোর দস্যুদিগকে মৌখিক ভক্তি করি, কিন্তু মনে মনে বলি সে নির্ব্বংশ হউক। সেইরূপ ভক্তিই সাধারণের জন্য ছিল।

যাহা হউক, চৈতন্য ধর্ম্ম প্রচারের ফলে প্রেমভক্তি সাধনের পথ বিস্তৃতি ও উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও মানব ভয়ের স্তর হইতে ক্রমান্বয়ে প্রেমভক্তি সাধনের স্তরে উঠিয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পৌত্তলিকপ্রধান আরব দেশে, মহাত্মা মহম্মদ একেশ্বরবাদমূলক প্রেমপ্রধান ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার

করিতে যাইয়া বধোদ্যত শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক তাহাকে সস্নেহে সদুপদেশ প্রদান করিয়া প্রেমের দ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। য়িহুদীদিগের দেশে মহাত্মা যীশু একেশ্বরবাদমূলক প্রেমপ্রধান খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইয়া রাজকীয় বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন। তৎপরে ঘাতকেরা যখন তাঁহাকে দণ্ডাজ্ঞা সাধনের জন্য বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেছিল, তখন তিনি একাগ্রচিত্তে সেই ঘাতকদিগের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন যে, হে ঈশ্বর! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, ইহারা অজ্ঞানতাবশতঃ কি করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। মানব প্রেমের এরূপ অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল। এই জন্যই শুনা যায়, বাইবেলে উপদেশ আছে শত্রুকেও ভালবাসিবে। অপকারীর প্রত্যপকার করিবে না। প্রতিবাসীকে ভালবাসিবে। যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে এই প্রেমময়ের প্রেমলীলার মাহাত্ম্য পৃথিবীব্যাপীরূপে কীর্ত্তিত হইতেছে। অতএব এক্ষণে আমরা সেই প্রেমময়ের প্রতি অহৈতুকী ভক্তিলাভের জন্য সকাতরে প্রার্থনা করি।

প্রার্থনা।

হে অনন্ত প্রেমের প্রস্রবণ! তুমি আমাদিগকে এক বিন্দু প্রেম দান করিয়া এই সংসার-দগ্ধ হৃদয় অভিষিক্ত কর। আমরা তদ্দ্বারা হৃদয়ের শুষ্কতা নিবারণ করিয়া কৃতার্থ হই। আমরা যেন রোগে, শোকে, দুঃখে, সুখে, তোমার প্রেম স্পর্শ অনুভব করিতে পারি। আমরা গুরুজন ও অন্যান্য হিতৈষীদিগের প্রেম অনুভব করিয়া তাঁহাদিগকে কত ভক্তি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু

তুমি যে আমাদিগকে অযাচিত ভাবে অজস্র প্রেমধারা বর্ষণ করিয়া জীবিত রাখিয়াছ, জীবনের সঙ্গীরূপে প্রতিনিয়ত ভালবাসিতেছ, এজন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আমরা সময় পাই না বা স্মরণ করিতে পারি না। ইহাই কিন্তু আমাদের সকল দুর্গতির মূল। অতএব হে প্রভু! তুমি আমাদের এই অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি কৃতঘ্নতা পাপ হইতে রক্ষা করিয়া আমাদিগকে ভক্তি শিক্ষা দেও। আমরা যেন তোমাকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে ভক্তি করিতে শিখি। হে প্রেমময়! বাহ্যজগতের মধ্য দিয়া তুমি যে প্রেম প্রবাহিত করিতেছ, উহার মূলেও তুমি, ইহা যেন আমাদিগের স্মরণ থাকে। আমরা যেন তোমার প্রেম স্পর্শে হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ ও পরশ্রী-কাতরতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমূহ চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে পারি। তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। হে অনন্তদেব! তুমিই বেদান্তবাদীর ব্রহ্ম, বৈষ্ণবের হরি, মুসল-মানের আল্লা, খ্রীষ্টানের গড্ ইত্যাদি বিবিধ ভাষা ও জাতিগত কল্পিত উপাধি ধারণ করিয়া সকল স্থলেই সকল জাতিতে তোমার অনন্ত প্রেমলীলার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছ; ইহা স্মরণ রাখিয়া আমরা যেন সকল ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতা ভগ্নীগণকে সমান ভালবাসিয়া তোমার প্রেমের মহিমা বিস্তার করিতে পারি, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

স্বরূপ তত্ত্ব।

প্রাণেশ্বরং—প্রাণ অর্থ জীবন। জীবিত অবস্থা যে শক্তি দ্বারা সম্ভব হয়, সেই শক্তির নাম প্রাণনশক্তি বা জীবনীশক্তি।

এই শক্তি বিশ্বকর্ত্তার অত্যাশ্চর্য্য কৌশলপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাড়িত, চুম্বক, মাধ্যাকর্ষণ, রাসায়নিক আকর্ষণ ইত্যাদি নানারূপে ব্যাপ্ত শক্তিপুঞ্জের আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপিও কোন বৈজ্ঞানিক, এই জৈবীশক্তির রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। আমরা স্থূল দৃষ্টিতে জগতে জীব ও জড় এই দুইটী বস্তু দেখিতে পাই এবং জড়জগৎকে আমরা নির্জীব অর্থাৎ প্রাণহীন বলি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বৈজ্ঞানিকেরা আণুবীক্ষণিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, জড়জগৎও প্রাণহীন নহে। আমরা সম্মুখে যে মৃত্তিকারাশি জড়রূপে দেখি, উহা কোটী কোটী জীবাণুর সমষ্টি। আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা যে বায়ুরাশি দেহাভ্যন্তরে যাতায়াত করে, উহাতে লক্ষ লক্ষ জীবাণু মিশ্রিত থাকে। এই সমুদয় জীব, জীবাণু ও উদ্ভিদদিগের উৎপত্তি প্রণালী ও জীবনীশক্তি একরূপ নহে। বহু প্রকার। উদ্ভিদজগতে দেখা যায়, অনেক বৃক্ষের বীজ হইতে চারা হয়; কোন বৃক্ষের শাখা কর্ত্তনপূর্ব্বক প্রোথিত করিলে আর একটী বৃক্ষে পরিণত হয়; জীবজগতেও ঐ জীবের উৎপত্তি প্রণালী সাধারণতঃ দুই প্রকার, যথা স্তন্যপায়ী ও অণ্ডজ। আবার কোন কোন জীব, বস্তু বিশেষ পচিয়া উৎপন্ন হয়। কোন কোন জীব আপনা আপনি বিভক্ত হইয়া প্রত্যেকে স্বতন্ত্র জীবে পরিণত হয়। একটী সূচ্যগ্রে যে জলবিন্দু থাকিতে পারে, তাহাতে দশ লক্ষ কীটাণু অবস্থান করে, ইহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল। কিন্তু পাঠক, তুমি আমি ইহা কল্পনায় আনিতে পারি না। তথাপি ইহা সমর্থন করিবার ভাল যুক্তি রহিয়াছে যথা, সেই অনন্ত

লীলাময়ের প্রাণন ক্রিয়া অর্থাৎ জীবনীশক্তি অনন্ত ভাবে ব্যাপ্ত-রূপে জগতে অবস্থিতি করিতেছে। যে শক্তির অন্তর্গত থাকিয়া এই গমনশীল জগৎ জীবন্তরূপে প্রতিভাত হইতেছে; সেই শক্তি অবিচ্ছিন্নরূপে বর্ত্তমান। জগৎ যদি বাস্তবিক প্রাণহীন অর্থাৎ মৃত হইত, তাহা হইলে উহার গতি, উন্নতি, বিকাশ, এ সমুদয় কিছুই সম্ভব হইত না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, সেই প্রাণেশ্বরের প্রাণন শক্তির বলে এই জীবন্ত জগতের কার্য্য চলিতেছে। তাঁহার অসামান্য শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়করূপে যখন যে বস্তুর মধ্য দিয়া যে উপকরণ সহযোগে প্রাণন ক্রিয়ার বিকাশ করেন, তখন তাহাই আমাদের নিকট পৃথক জীবরূপে প্রতিভাত হয়।

অতএব প্রাণরূপী তিনিই এই অনন্ত জগতে অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া সকল জীবের জীবত্ব প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার জীবলীলা সম্পাদন করিতেছেন। ধাতু, উপধাতু ও ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত যাহাদিগকে আমরা নির্জীব জড় ও জীবদেহের উপকরণ বলি, উহারাও প্রত্যেকে স্ব স্ব গুণক্রিয়ার আধাররূপে জীবন্ত। ঐ গুণক্রিয়াই উহাদের প্রাণ বলিতে হইবে। অতএব এই জীবনীশক্তি জগদ্ব্যাপ্ত; কোন স্থানে ইহার অন্তরাল নাই। এইজন্য তিনি প্রাণেশ্বরম্।

প্রার্থনা।

হে প্রাণেশ্বর! আমরা যেন তোমাকেই একমাত্র আমাদের প্রাণরূপে অনুভব করিতে পারি, তোমার অবিচ্ছিন্ন ব্যাপ্তিময় জৈবীশক্তির আশ্রয়ে সকল জীবের জীবত্ব সম্ভব ও জীবনরক্ষা

হইতেছে। তুমিই সমষ্টিভাবে জগতের প্রাণরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমুদয় জগৎকার্য্য জীবন্তভাবে পরিচালিত করিতেছ। আবার তুমিই ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক জীব ও জীবাণুর প্রাণরূপে, প্রত্যেক জড়পদার্থের গুণ, ক্রিয়া, ও আকর্ষণী শক্তিরূপে তাহাদের সকলেরই জীবন্ত ভাব প্রদর্শন করিতেছ। এই সচল জগৎ নিশ্চয়ই জীবন্ত, ইহার প্রকৃত জীবনই একমাত্র তুমি। অতএব হে জীবিতেশ্বর! আমরা যেন তোমার প্রত্যক্ষ বিদ্যমানতা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অনুভব করিতে সমর্থ হই। আমরা যেন তোমাকে হারাইয়া জীবন্মৃত না হই। তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। আমরা বায়স্কোপ ক্রীড়াকারীদিগের ছায়াচিত্রের জীবন্ত ভাব দেখিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু তুমি যে এই বিশ্বরূপ চিত্রপটে আমাদিগকে এই জীবলীলারূপে অদ্ভুত বায়স্কোপ দেখাইতেছ, ইহা আমরা দেখিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না। অতএব আমাদিগের এই ভ্রম দূর করিয়া তুমিই আমাদের জীবন্তভাবের হেতুরূপে স্মরণ পথে অবস্থিতি কর।

স্বরূপ তত্ত্ব।

সর্ব্বময়ং—ইচ্ছাময়ং—সর্ব্বকারণঃ কারণম্—তিনি সকল কারণের মহাকারণরূপে, সর্ব্বত্র ইচ্ছাশক্তিরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ একঢালা ভাবে, বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। কোন স্থানে, কোন কালে, কোন অবস্থায় তাঁহার কোন অন্তরাল বা অবকাশ নাই। তিনি আমাদের অন্তরে, বাহিরে, জলে, স্থলে, শূন্যে, সূক্ষ্মে, স্থূলে ও আমাদের অনুভূত, অপরিজ্ঞাত বিষয়সমূহে, সমানভাবে অবস্থিতি করিতেছেন।

এই জন্য তিনি সর্ব্বময়। এই সর্ব্বময় স্বরূপই মানবের প্রত্যক্ষ সাধনের আশ্রয়। সাধক এই স্বরূপ অবলম্বন করিয়া তাঁহার বর্ত্তমানতা অনুভব করেন।

ইচ্ছা অর্থ অভিলাষ, ভাবার্থ হইতেছে জ্ঞানীর জ্ঞানক্রিয়ার বিকাশমূলক শক্তি। জ্ঞাতা যখন স্বস্বরূপে অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহাকে অব্যক্ত বলা যায়। কিন্তু যখন সেই জ্ঞানের প্রকাশময় ভাবরূপ জগতে প্রকাশিত হয়, তখন সেই ভাবমূলক প্রকাশ শক্তিকে আমরা ইচ্ছাশক্তি বলি। অতএব এই প্রকাশময় ব্যক্ত জগৎ তাঁহার জ্ঞানের বিকাশরূপী ইচ্ছাপ্রসূত। যেখানে জ্ঞানের বিকাশ, সেইখানে ইচ্ছার প্রকাশ। সুতরাং জ্ঞান-ক্রিয়াকেই ইচ্ছা বলা যায়। এই জগৎ সেই অনন্ত জ্ঞানময়ের জ্ঞানক্রিয়ার অধীন বলিয়া সকলই তাঁহার ইচ্ছাধীন। তাঁহার অনিচ্ছায় কিছু হইতে পারে না। তাঁহার ইচ্ছায় কোন বাধা বিঘ্ন থাকিতে পারে না; কারণ, তিনি নিরপেক্ষ ও সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি সকল কারণের মহাকারণরূপে সকল কার্য্যের পশ্চাতে রহিয়াছেন। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে কারণ ভিন্ন কোন কার্য্য হয় না। আবার কার্য্য ভিন্ন কারণ হইতে পারে না। কারণ যাহা, তাহার অবশ্য বিশেষত্ব আছে; যাহার বিশেষত্ব আছে, তাহা প্রকাশমান হেতু কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন; ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং কার্য্যকারণ বিশ্লেষণ করিলে উহার গোড়া পাওয়া যায় না। এইজন্যই যাহা নির্ব্বিশেষ, যে কারণের মূলে আর একটী কার্য্য নাই, যাহা প্রকৃত জ্ঞানমূলক ইচ্ছাশক্তির বিকাশমাত্র, তাহাকেই সকল কারণের মহাকারণ বলা যায়। সেই অনন্ত জ্ঞানময়ের জ্ঞানের বিকাশরূপী অনন্ত শক্তি

সকল কার্য্যের মূলে বিদ্যমান থাকায় তাঁহার এই অনন্তলীলা সম্পন্ন হইতেছে।

যিনি এই জগতের কর্ত্তা তিনিই কারণ, তিনিই উপাদান। তাঁহারই ইচ্ছায় কর্ম্মজগৎ উৎপন্ন হইয়া চলিতেছে। অতএব তিনিই সকল কার্য্যের, সকল কারণের মহাকারণ। আমাদের সম্মুখে যে কোন বিষয় সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য উহার কারণ অনুসন্ধান না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। কিন্তু সে কারণ আমরা দুই প্রকারে অনুসন্ধান করি; যথা মুখ্য কারণ ও গৌণ কারণ। যেমন এক ব্যক্তিকে অন্য এক ব্যক্তি বধ করিল। সেই হত ব্যক্তির সহিত আমাদের সুখ দুঃখের সম্বন্ধ থাকিলে আমরা তাহার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করি। এস্থলে তাহার মৃত্যুর প্রধান বা মুখ্য কারণ হইতেছে, হত্যাকারীর অস্ত্রাঘাত বা অন্য কোন ব্যবহার। গৌণ কারণ হইতেছে, সেই হত ব্যক্তির অসাবধানতা বা তাহার আত্মরক্ষায় অসমর্থতা। ইহাতে হত ও হত্যাকারী সম্বন্ধে কোন পাপপুণ্য বা ন্যায়ান্যায়ের বিচার করা হইতেছে না। এক্ষণে আমরা দেখিব, সে ঈশ্বরের অনিচ্ছায় হত হইল কি না? কিন্তু তাহা অসম্ভব। কারণ ঈশ্বরের অনিচ্ছাস্বত্বে কোন ঘটনা ঘটিতে হইলে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য তাঁহার নিরপেক্ষ স্বাধীনতায় বাধা পড়ে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাই যে সকল কারণের কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই মীমাংসায় আমরা শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হই। ঈশ্বরই সকল কারণের কারণ, ইহাতে সন্দিহান হইয়া হত্যাকারীকেই তাহার মৃত্যুর সর্ব্বপ্রধান কারণ বলিয়া সাব্যস্ত করিলে, তাহার হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ ঐ হত্যাকারীকে হত্যা

না করিলে কিছুতেই তৃপ্তি হইত না। কিন্তু তাহা অসম্ভব, অকর্ত্তব্য, ধর্ম্মবিরোধী। সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে যে, হত্যাকারী তাহার মৃত্যুর অবলম্বন মাত্র; ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাহার মৃত্যু হইল। এস্থলে সেই হত্যাকারী দণ্ডপ্রাপ্তির যোগ্য কি পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য, সে বিষয় বিচারাধীন। সে যাহাই হউক, ঈশ্বরেচ্ছাই তাহার মৃত্যুর একমাত্র কারণ, ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত ও শান্তিলাভের উপায়। কার্য্য মাত্রেরই কারণের কারণরূপে তিনি অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সমুদয়ের পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিতেছেন, ইহাই অতিশয় সত্য কথা। অতএব আমরা এক্ষণে সেই ইচ্ছাময়ের আনুগত্যলাভের জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি।

প্রার্থনা।

হে ইচ্ছাময় সর্ব্বব্যাপী! তুমি জল, স্থল, শূন্যে সকল স্থানে সমানভাবে থাকিয়া তোমার স্বাধীন ইচ্ছার পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছ। কিন্তু আমরা এই বিশ্বাসটা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় নানা প্রকার অশান্তি ভোগ করি। আমরা যেখানে শূন্য দেখি, যেখানে অন্ধকার দেখি, যেখানে অধর্ম্মের জয় দেখি, সেখানে তোমার বিদ্যমানতা অনুভব করিতে পারি না। তুমি যে সে সমুদয় স্থানে কিরূপে অবস্থান কর এবং সময় সময় হারাইয়া যাও, ইহা আমাদিগকে বুঝিবার শক্তি প্রদান কর। তোমার উদ্দেশ্য ও কার্য্য সর্ব্বদা ন্যায়পরতার অনুসরণ করে। অথচ অনেক স্থলে তোমার অস্তিত্ব একেবারেই বিলুপ্ত বলিয়া বোধ হয়; ইহার কারণ আমাদিগকে বুঝাইয়া তোমার প্রতি

আমাদের বিশ্বাস নির্ভর করিবার শক্তি প্রদান কর। হে ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছায় সমুদয় হইতেছে এবং তোমার ইচ্ছায় যাহা হইবে না, তাহা হওয়া বন্ধ হইতেছে। কিন্তু আমরা তাহা বুঝিতে না পারিয়া তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিয়া কত প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসি। আমরা কত প্রকার ভ্রম কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ হইয়া ছটফট করি; আবার তুমি দয়া করিয়া কোন গতিকে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়া থাক। হে হৃদয়নাথ! আমরা যেন সর্ব্বদা তোমার ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতে পারি, তুমি আমাদিগকে এইরূপ স্মৃতিশক্তি প্রদান কর। আমাদের একান্ত প্রার্থনা এই যে, যেন ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কার্য্যে তোমার ইচ্ছা পরিষ্কাররূপে আমরা বুঝিয়া ধরিয়া লইতে পারি। আমরা যাহাতে তোমার ইঙ্গিত নির্দ্দেশ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, তুমি আমাদিগকে সেইরূপ জ্ঞানালোক প্রদান কর।

স্বরূপ তত্ত্ব।

নির্ব্বিকারং-পবিত্রং—অর্থাৎ তিনি বিকারশূন্য। তাঁহার কোন অবস্থায় বিকার বা রূপান্তর নাই। অথবা বিকার প্রাপ্তির হেতুস্বরূপ কোন ভেজাল তাঁহাতে নাই। তিনি সর্ব্বাবস্থায় অতি বিশুদ্ধ, খাঁটী। তিনি গুণাতীত, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ, তমঃ প্রভৃতি কোন গুণের বশ নহেন। গুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; এইজন্যই তিনি নির্গুণ। তিনি সমুদয় বিষয় জগতের স্রষ্টা, পাতা, আশ্রয়দাতা হইয়াও পদ্মপত্রস্থিত বারির ন্যায় তাহাতে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন। বিষয় তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, তাঁহারই আশ্রিত। কিন্তু তাঁহার আশ্রিত

হইয়াও আবার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অপাপবিদ্ধম্। পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। পাপরূপ অকর্ত্তব্য যাহা, তাহাতে জীবেরই অধিকার। তিনি নিষ্ক্রিয় নিগুর্ণ এজন্য সর্ব্বদা বিশুদ্ধ খাঁটী; এইজন্যই তাঁহার স্বরূপগত একটী উপাধি "পবিত্রং"। এই সগুণ বিষয় জগতের আশ্রয়রূপী নিগুর্ণ বিশুদ্ধ পবিত্রস্বরূপকে আমরা অজ্ঞানতার আবরণে দেখিতে পাই না। অজ্ঞানতারূপ অপবিত্রতার আবরণ ভেদ করিতে পারিলে সেই পরম জ্যোতির্ম্ময় সুনির্ম্মল পবিত্রস্বরূপকে উপলব্ধি করা যায়। তাঁহার জ্ঞানময় পবিত্রস্বরূপের অনুপ্রকাশরূপী মানবজ্ঞান, যাহা আমরা শিক্ষাদ্বারা উপার্জ্জন করি, উহাও সর্ব্বদা নির্ব্বিকার ও পবিত্র। যে জ্ঞান বস্তু সমষ্টিভাবে বিশ্বব্যাপী, তাহাই ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক মানবে বিবেকরূপে প্রকাশিত। সুতরাং এই অনুপ্রকাশরূপী মানবজ্ঞান যখন সেই অনন্তজ্ঞানেরই স্ফুলিঙ্গরূপে প্রকাশ, তখন ইহা নির্ব্বিকার। এই জ্ঞান আমাদের জন্মের পূর্ব্বেও যেমন ছিল, বর্ত্তমানেও সেইরূপ আছে, পরেও সেইরূপ থাকিবে। ইহা আমাতেও যেরূপ, তোমাতেও সেইরূপ, অন্য ব্যক্তিতেও সেইরূপ। সুতরাং দেশ, কাল, অবস্থা ও আধারের পরিবর্ত্তনে এই জ্ঞানের পরিবর্ত্তন নাই। ইহা সর্ব্বদা স্বতন্ত্র ও স্বপ্রকাশরূপে আমাদের অন্তরে বিরাজিত আছে।

আমরা প্রত্যক্ষগত বিষয় জগতের সগুণ প্রকাশ ভাব গ্রহণ করিয়া তাহাতে অনুমান ও বিচার দ্বারা ঐ সগুণের মধ্যে নির্গুণকে ধরিয়াই অন্তরে পবিত্রতার আদর্শ স্থাপন করি। অতএব পবিত্রতা লাভ করিতে হইলে, মানবকে ভ্রম কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া, চাক্ষুষ ভ্রম ও অনভিজ্ঞতা দূর করিবার জন্য

সর্ব্বদা জ্ঞানোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। এই জ্ঞানোপার্জ্জনের দুইটী দিক, যথা আত্মজ্ঞানের দিক অর্থাৎ আমি কি? আমার মূল কোথায়, আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় আমাকে যাইতে হইবে। ইত্যাদি চিন্তা ও বিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভপূর্ব্বক আত্মাকে পবিত্র করিতে হইবে। আর একটী দিক হইতেছে বিজ্ঞানের দিক। ইহা মানবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ রক্ষা এবং আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিশেষ আবশ্যক। কেবলমাত্র আত্মশুদ্ধি লাভ করিয়া বসিয়া থাকিলে তাহার চলে না। তাহার যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ কর্ম্ম সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং প্রত্যেক পদার্থের সংশ্রব হইতে পবিত্রতা রক্ষার জন্য সেই পদার্থকে চিনিতে হইবে যে, কোনটী পবিত্রতা রক্ষার অনুকূল, এবং কোনটী প্রতিকূল। যেমন দেহের পবিত্রতা স্বাস্থ্যরক্ষা। রুগ্ন দেহ অপবিত্র। সুতরাং দেহের পবিত্রতা রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা লাভ করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। দেহ রক্ষার জন্য প্রধানতঃ খাদ্য, পানীয় ও বিশুদ্ধ বায়ু এই তিনটীর আবশ্যক, কিন্তু কোন খাদ্য গ্রহণে দেহ সুস্থ ও সবল থাকে, মনোবৃত্তি সতেজ থাকে এবং কোন খাদ্য গ্রহণে দেহ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, কি প্রকার পানীয় উপকারী, কোনটি অপকারী ইত্যাদি জানা না থাকিলে কখনই শরীর সুস্থ রাখিতে পারা যায় না। এই জন্যই আমাদের প্রত্যেক খাদ্য পানীয় বস্তুর গুণ, সাক্ষাৎ ও পরম্পরিত ক্রিয়া জানা বিশেষ আবশ্যক। ঈশ্বরের স্মরণ করিয়া অপকারী বস্তু আহার করিলে তাহার ক্রিয়া ফল পরিবর্ত্তিত হইয়া উপকার হইতে পারে না। তিনি আমাদিগকে শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদান করিয়া আত্মরক্ষার

উপায় করিয়া দিয়াছেন, আমরা চেষ্টা ও সাধনবলে জ্ঞান বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সুস্থ, সুন্দর, সবল হইয়া, সর্ব্বপ্রকারে পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হই। অনেকের মত, দেহ সুস্থ অসুস্থ যাহা হউক, অন্তঃকরণ ও আত্মা সুস্থ থাকিলেই হইল। তদ্দ্বারা সাধনবলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। কিন্তু ইহা অতিশয় ভ্রান্ত সংস্কার। কারণ, দেহ বলিতে কেবল সাকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বুঝায় না, উহাকে স্থূলদেহ বলে; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ইহারা সূক্ষ্মদেহ; ইহারাও দেহ। সুতরাং এই সূক্ষ্মদেহের কোন অংশ পীড়িত হইলে ঈশ্বর সাধন অসম্ভব। অতএব আমাদিগকে খাদ্য পানীয়ের উৎকর্ষতা, উপকারিতা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে দেখিতে হইবে, ব্যবহার্য্য পদার্থ স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহের উপকারী কি না? যাহা কেবল স্থূলদেহের পোষক ও বলকারক অথচ সূক্ষ্মদেহের অর্থাৎ মানসিক বৃত্তির অপকারক তাহা গ্রহণীয় নহে। যাহা আয়ু, বল, পুষ্টিজনক সত্ত্বগুণের উত্তেজক অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহের উৎকর্ষতা সাধক সেইরূপ খাদ্য, পানীয় গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এ সমুদয় তত্ত্ব চিকিৎসা বিজ্ঞানে সম্যক্ প্রকার পাওয়া যায় না। কারণ চিকিৎসা শাস্ত্রে বস্তুর সূক্ষ্মদেহের উপর সাক্ষাৎ ও পরম্পরিত ক্রিয়া ও তাহার অধিক দিন ব্যবহার জন্য, কালগত প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি তত্ত্ব তাদৃশ ভালরূপ বর্ণিত হয় নাই। আর যাহা সূক্ষ্মদেহ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও দেশকাল অবস্থার পরিবর্ত্তনে এক্ষণে অনেক পরিত্যক্ত হইয়াছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান যে কেবল রোগীদিগের জন্যই, ইহা বলা বাহুল্য। সুতরাং কেবলমাত্র ভৈষজ্যতত্ত্ব অর্থাৎ দ্রব্যগুণ শাস্ত্র দেখিয়া খাদ্যাখাদ্যের বিচার করা যায় না। এই

বিষয়টী বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ও লোকপরম্পরা দ্বারা অবগত হইয়া নিজের স্বাধীন বিবেকের সহিত ঐক্য করিয়া, অবস্থা বিশেষে গ্রহণ বর্জ্জন করিতে হয়। যেমন দুগ্ধ উৎকৃষ্ট পানীয়, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কেবলমাত্র দুগ্ধের উপর নির্ভর করিয়া জীবন রক্ষা হইতে পারে। তবে অবস্থা ভেদে উহা ব্যবহারের নিষেধও আছে। যথা নবজ্বর, যকৃৎ প্লীহাদি রোগে, ক্ষতরোগে, তরুণ শ্লেষ্মারোগে দুগ্ধ অপকারী। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা মানবের নিত্য ব্যবহার্য্য হওয়া কর্ত্তব্য। আর একটী আমাদের দেশের ব্যবহার্য্য পানীয় যথা সুরা; মদ্য, মদ, মদিরা ইত্যাদি ইহার নাম। এ পানীয়টা আমাদের দেশের, বিশেষতঃ ভদ্রসমাজের অবনতি সাধনকারী বিষতুল্য পদার্থ। বিষ কোন পরিবারস্থ এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক সেবিত হইলে সেই ব্যক্তিরই প্রাণনষ্ট হয়। কিন্তু সুরা কোন পরিবারস্থ এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক অভ্যস্ত পানীয়রূপে সেবিত হইলে ক্রমান্বয়ে সকলকেই আকর্ষণ করিয়া ধনে প্রাণে সংহার করে। যাহা হউক আমার মুখে সুরার নিন্দা কেইবা শুনিতে চাহিতেছে বা শুনিয়া গ্রাহ্য করিতেছে। অতএব যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া দেখা যাউক যে, সুরা আমাদের অপরিহার্য্য পানীয় কি না? ইহা দ্বারা মানব দেহের স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক অবস্থায় উপকার হইতে পারে কি না? ইহা দ্বারা কি অপকার হইতেছে? এবং এই অপকারী পদার্থ কিজন্য আমাদের দেশে এতদূর বিস্তৃতি লাভ করিল? প্রথমতঃ সুরাপানের অনুকূল মত যাহা, যদ্দ্বারা সুরাপায়ীরা উহার উপকারিতার সমর্থন করেন, এক্ষণে সেই মত খণ্ডন করা যাইতেছে। তাঁহাদিগের অনুকূল মত এই যে, প্রাচীন আর্য্য

ঋষিরা সোমরস নামক মদিরা পান করিতেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ও ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে ইহার যথেষ্ট গুণাবলী বর্ণিত আছে। যথাঃ—সুরা মত্ততাকারক, নিদ্রাকারক, আনন্দ উদ্দীপক, বলকারক ও উত্তেজক ইত্যাদি। ইহা পাশ্চাত্য সভ্য ইংরেজ জাতির অতিশয় প্রিয় পানীয়। হিন্দুদিগের তান্ত্রিক সাধনমূলক পঞ্চমকারের মধ্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া ইহা ধর্ম্ম-কার্য্যের অঙ্গীভূত ছিল ইত্যাদি। এক্ষণে দেখা যাউক, এই সমুদয় যুক্তির মধ্যে কতদূর সত্য নিহিত আছে। প্রাচীন আর্য্যদিগের সামাজিক রীতি-নীতি আমাদের শ্রদ্ধেয় ও আদর্শ-স্থানীয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কোন রীতি-নীতি অবিচারে গ্রহণ করা, বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানবের পক্ষে কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। অন্ধভাবে আপনার বিবেচনা শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া কোন বিষয়ের অনুকরণ করা নিতান্ত হতভাগ্য ও মূর্খের কার্য্য। মানবজ্ঞান স্বভাবতঃ ভ্রমশীল, অপূর্ণতাযুক্ত ও সসীম। মানব আদিম অবস্থায় যখন তীর-ধনু লইয়া বনে বনে ভ্রমণ করতঃ শিকারপূর্ব্বক পশুপক্ষী বধ করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করিতেন, গৃহাভাবে পর্ব্বত-গহ্বরে ও বৃক্ষ-কোটরে আশ্রয় লইতেন; তখন যে তাঁহাদের সামাজিক ও নৈতিক দুর্গতি অধিক পরিমাণে ছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। স্বল্প সংখ্যক মানবের মধ্যে যাঁহারা একটু আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতেন, তাঁহারাই ঋষিপদবাচ্য হইতেন। কিন্তু তাহা হইলেও বিজ্ঞানচর্চ্চার অভাবে তাঁহাদের সামাজিক দুর্নীতি ও ভ্রম কুসংস্কার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সতীদাহ, নরবলি, অবিহিত বিবাহ, বহু বিবাহ ইত্যাদি তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তখন সময়

ও সুযোগাভাবে তাঁহারা দ্রব্যগুণাদি সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনা করিয়া খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিতে পারেন নাই। সেই অবস্থায় মাদক সেবন দ্বারা শোক দুঃখ নিবারণ ও আনন্দ সম্ভোগ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে।

সোমলতা নামক উদ্ভিজ্জ পূর্ব্বকালে পার্ব্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যাইত; এক্ষণে উহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে বলিয়া উহার কোন বিশেষ গুণ থাকিলেও তৎসম্বন্ধে আলোচনা বৃথা। সুতরাং প্রাচীনেরা ব্যবহার করিতেন বলিয়া সুরাপান কোন মতেই অনুকরণীয় হইতে পারে না। চিকিৎসা শাস্ত্রে উহার যে সমুদয় গুণক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, উহা অবশ্য মিথ্যা নহে। কিন্তু সেই সমুদয় শাস্ত্রে উহার দোষ বর্ণিত হয় নাই এবং ঐ সমুদয় গুণক্রিয়া কেবল রোগীদিগের জন্যই নির্ব্বাচিত, সুস্থ ব্যক্তির জন্য নহে। যেমন কোন বেদনাযুক্ত যন্ত্রণাদায়ক পীড়ায় সুরা নিদ্রাকারকরূপে উপকার করে। কোন বিমর্ষ ও অবসন্নভাবাপন্ন উন্মাদ রোগীর পক্ষে আনন্দবিধায়ক স্নায়ুর উত্তেজক বলিয়া উপকারী। হিমাঙ্গ অবস্থাপন্ন রোগীর রক্তের গতির বৃদ্ধি করিয়া সার্ব্বাঙ্গিক উত্তেজনা সাধন করে। ইহা সুরার উত্তেজক ক্রিয়ার ফল। ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া উত্তেজক হইলেও পরম্পরিত ক্রিয়া অবসাদক; এজন্য সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে ইহা বিশেষ অপকারী। মদ্যপায়ীদিগের মদ্যপান সুখ সম্ভোগের পর অজ্ঞান ও অবসন্নাবস্থায় রাস্তার নর্দ্দামায় বা ঐরূপ কোন অযথা স্থানে পতিত থাকা, ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অধিক দিন সুরা ব্যবহারে মানসিক দুর্ব্বলতারূপ এক প্রকার অস্বাভাবিক ভাব আনয়ন করে; ইহা যাঁহারা মদ্যপায়ীদিগের সহিত আলাপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন।

পাশ্চাত্য সভ্য ইংরেজজাতি ভয়ানক শীতপ্রধান দেশবাসী। তাঁহাদের কেবল গাত্রবস্ত্র দ্বারা শীত নিবারণ করা দুরূহ; এজন্য পুনঃ পুনঃ উত্তেজক পানীয় সেবন দ্বারা শীত নিবারণ করা তাঁহাদিগের অভাব পক্ষে সুন্দর উপায়। এইজন্য তাঁহাদের ব্যবহৃত পোর্ট, ব্রাণ্ডি ইত্যাদি মদিরার মাদক ক্রিয়া অল্প, উত্তেজক ক্রিয়া অধিক। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তাঁহারা সুরাকে প্রিয় পানীয়রূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে আসক্ত ও অভ্যস্ত হইয়া থাকেন এবং তদবস্থায় তাঁহারা আমাদের এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে আসিয়াও অভ্যাস ত্যাগ করিতে না পারায় সুরাপান করিয়া হতভাগ্য ও নির্ব্বোধ বাঙ্গালীজাতির আদর্শ-স্থানীয় হইয়া পড়েন। তাঁহাদের চরিত্রগত উৎকৃষ্ট গুণসমূহ যথা:—অবিচলিত অধ্যবসায়, অসামান্য সাহস, আত্মনির্ভরতা, বিলাসবিমুখতা, প্রার্থনাপরায়ণতা, ন্যায়পরতা ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া আমরা সুরাপানের অনুকরণ করিয়া তাঁহাদের সহিত মিশিবার ও তাঁহাদের প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিয়া থাকি। ইহার ন্যায় মূর্খতা আর কি হইতে পারে!

ভারতে চৈতন্য যুগে যখন মানবকুল ধর্ম্মভাবে মাতিয়া উঠিয়া দলে দলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল, তখন হিন্দুধর্ম্মের এই দুর্গতি দেখিয়া সমাজের নেতা ব্রাহ্মণেরা এই আসন্ন বিপদ হইতে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিবার কল্পনায় সাধারণ লোককে মদ্য মাংসাদি সংযুক্ত উপাসনার প্রলোভন দেখাইয়া ভুলাইবার জন্য এই তান্ত্রিক উপাসনামূলক পঞ্চমকারের সৃষ্টি করেন। তাঁহা-দিগের এই কুহকে পড়িয়া অনেক দুর্ব্বল চিত্ত, ইন্দ্রিয়াসক্ত লোভী লোক তাঁহাদের দলের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। কারণ, চৈতন্য

ধর্ম্মাবলম্বীরা মদ্য মাংসের বিরোধী। ফলে, ধর্ম্ম কার্য্যে এরূপ মত্ততাকারক অর্থাৎ অজ্ঞানতা উৎপাদক দ্রব্য ব্যবহার করা কতদূর সঙ্গত, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। সংসারে থাকিয়া জনকোলাহলের প্রভাবে মনস্থির করা যায় না বলিয়া, জ্ঞানপিপাসু সাধকগণ পাহাড় পর্ব্বতে, বনে, জঙ্গলে, নির্জ্জনে থাকিয়া ঈশ্বর উপাসনা করিয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। আর মাদক দ্রব্যে সেই সাধনার সহায়তা করিতে পারে, ইহা কখনই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীনকালে মাদকপ্রিয় ব্যক্তিগণ সমাজে মাদকের প্রচলন রাখিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। গাঁজা, অহিফেন, চরস, চণ্ডু, গুলি, সিদ্ধি, ধুতুরা ইত্যাদির জন্য একটা নূতন দেবতা নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল মহাদেব। ইনি জটাজুটাসমন্বিত চিতা-ভস্মধারী শ্মশানবাসী। ইঁহার কার্য্য হইল, শ্মশানে বসিয়া গাঁজা, গুলি, সিদ্ধি, ধুতুরা ইত্যাদি মাদক সেবনপূর্ব্বক অনবরত আনন্দে বিভোর হইয়া হরিনাম করা। ইনি আবার বম বম শব্দ করেন। এজন্য গাঁজাখোরেরা গাঁজায় দম দিবার পূর্ব্বে মহাদেবের স্মরণ করিয়া বম বম শব্দ করিয়া থাকেন। আমাদের পল্লীগ্রামে সত্যনারায়ণের ন্যায় ত্রিয়নাথের এক প্রকার মেলা দেওয়া হয়; তাহার পূজোপকরণ হইতেছে প্রধানতঃ তিন কলিকা গঞ্জিকা এবং তৎসহ চাটনি স্বরূপ কিছু মিষ্ট দ্রব্য বাতাসা ভোগ দেওয়া হয় এবং গঞ্জিকাদি মাদক দ্রব্যের মাহাত্ম্যপূর্ণ পাঁচালী পাঠপূর্ব্বক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। এ ভিন্ন শারদীয়া পূজা-বাড়ীতে দেবী বিসর্জ্জনান্তে মাদকের ছড়াছড়ি হইয়া থাকে।

যাহা হউক, এই সমুদয় সমাজগত ধর্ম্ম কার্য্যের আনু-সঙ্গিকরূপে নিয়মবদ্ধ মাদক দ্রব্যের ব্যবহার প্রথা; নেশা-খোরদিগের মাদক দ্রব্য প্রচলন রাখিবার ও আমোদ সম্ভোগের উপায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ইহা প্রাচীন প্রথা বলিয়া অবিচারে গ্রহণ করা স্বাধীন জ্ঞানবিবেকসম্পন্ন মানবের কর্ত্তব্য নহে। ইহা আপনার বিচার বুদ্ধি চাপিয়া রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পরের মুখে ঝাল খাওয়া। "যেমন অমুক উকিল বাবু বা জজ বাবু মদ খান। অমুক জ্ঞানী সাধু গাঁজা খান। অমুক বড়লোক বলিয়াছেন যে, মদ্যপানে কোন দোষ নাই। এই সকল কথায় নির্ভর ও বিশ্বাস করাই পরের মুখে ঝাল খাওয়া। এক্ষণে সাধারণ মাদক দ্রব্যগুলির দোষ গুণ সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। যথা:—সাধারণ মাদক দ্রব্য মাত্রেরই সাক্ষাৎ ক্রিয়া মত্ততাজনক ও অজ্ঞানতা উৎপাদক। যে জ্ঞানের জন্য মানব, জন্ম জন্ম অনন্ত আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বর সাধন করে, ইহাতে সেই জ্ঞান পদার্থই প্রথমতঃ ধ্বংস করে। আবার এই মাদকের পরম্পরিত ক্রিয়া ও বুদ্ধি লোপ করা। বহু দিন অভ্যস্তশীল মাদকসেবীদিগের মস্তিষ্ক এক প্রকার অস্বাভাবিক বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া যায়। মাদক মাত্রেরই সাধারণ গুণ যে, অভ্যস্ত হইয়া গেলে ইহার মত্ততাকারী শক্তি থাকে না; কাষেই নেশাখোরদিগের মত্ততাজনিত সুখ-সম্ভোগ করিতে হইলে, ক্রমান্বয়ে মাত্রাধিক্যরূপে ব্যবহারের আবশ্যক হইয়া থাকে। এই জন্যই মাদকসেবীরা অপরিমিতাচারী হইয়া সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাদকসমূহের মধ্যে সুরা অধিক মূল্যবান, তজ্জন্য মদ্যপায়ীদিগের অপরিমিত মদ্যপান হেতু আর্থিক দুর্দ্দশাযুক্ত

শোচনীয় অবস্থা হইয়া থাকে। এ ভিন্ন যাহাদিগের যকৃৎ, প্লীহা, ফুসফুস, হৃদপিণ্ড ইত্যাদির কোন প্রকার যান্ত্রিক দৌর্ব্বল্য বা কোন প্রকার দোষ আছে, তাহারা মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিলে ঐ সমুদয় যান্ত্রিক পীড়া বৰ্দ্ধিত হইয়া সাংঘাতিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অধিকাংশ মদ্যপায়ীদিগকে "লিভার-য়্যাবসেস্" নামক দুশ্চিকিৎস্য ভয়ঙ্কর ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। গাঁজা, অহিফেন, চরসাদি সেবীদিগকে শেষাবস্থায় প্রায়ই রক্তোৎকাশাদি, ফুস্ফুস্ রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায়। তাম্রকূট সেবীদিগকেও ঐরূপ ক্ষয় রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায়। তামাক ক্ষুধানাশ অর্থাৎ পরিপাক শক্তি নষ্ট করে, শরীরের কৃশতা ও দৌর্ব্বল্য উৎপাদন করে এবং পরিণামে ফুসফুসের পীড়া উৎপাদন করে। কিন্তু এই দোষবহুল ও স্বল্পগুণযুক্ত দ্রব্য যে কেন এত বিস্তৃতি লাভ করিল, ইহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে সাধারণতঃ মানুষ দেখা দেখিতেই সমুদয় শিখিয়া বসে, তখন দোষ গুণের বিচার করিবার সুযোগ পায় না। আবার মাদক মাত্রেরই এমনি দোষ, কোন গতিকে একবার অভ্যস্ত হইলে, তাহা আর ছাড়িবার উপায় নাই। তামাকসেবীরা ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে যে যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহাও তাদৃশ সন্তোষজনক নহে। যথা, তামাক শ্রমজীবীদিগের গুরুতর পরিশ্রমজনিত ক্লেশ নিবারণ করে। তাহার কারণ এই যে, ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া হৃদপিণ্ডের অবসাদক। কিন্তু অত্যন্ত পরিশ্রমী ব্যক্তি, কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলেও তাহার শ্রম অপনোদন হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাকে যে তামাকের সাহায্য লইতে হইবে, একথা কেবল তামাকসেবীরাই সমর্থন

করেন। তামাকের আর একটী গুণের কথা অনেকে বলেন যে, ইহা ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক; ইহাও তাদৃশ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না; কারণ, তামাকসেবীদিগের অধিকাংশকে কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। সুতরাং ইহা ব্যবহারের কোনই উপযোগিতা নাই। মদ্যপান সম্বন্ধে অনেকে মত প্রকাশ করেন, যুদ্ধ-বিগ্রহাদি নৃশংস কার্য্যে মনুষ্যকে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত এবং মমতাহীন করিয়া সহায়তা করে। কিন্তু এ সমুদয় মত এক্ষণে ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। মোট কথা, মত্ত ব্যক্তি দ্বারা কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলারূপে সাধিত হইতে পারে না।

আমি একদিন কোন রাজপথে কতকগুলি লোককে মৃত-সংকার কার্য্য সম্পন্ন করতঃ আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে আসিতে দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসায় অবগত হইলাম, তাহারা মদ্যপান করিয়া এই নির্ম্মম ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিল; তাহারই ফলে অল্প বয়স্ক মৃতের শোক প্রকাশের পরিবর্ত্তে নৃত্যগীত করিতেছে। যাহা হউক এই দৃশ্যটা বড়ই ঘৃণিত ও কদর্য্য বলিয়া মনে হইল। সজ্ঞান অবস্থায় যে ঐ সমুদয় কার্য্য সমাধা হইতে পারে না, ইহা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। যাহা হউক, স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তির কোন কালে কোন অবস্থায় কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহারের উপযোগিতা ও আবশ্যকতা নাই। ইহা অতিশয় সত্য কথা। যে সমুদয় মাদক দ্রব্য সুস্থ ব্যক্তির ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিস্তৃত সমালোচনা করা হইল, ঐ সমুদয় দ্রব্য রোগীদিগের উপর কার্য্যকরী শক্তিরূপে বহুবিধ গুণসম্পন্ন। যেমন সর্পবিষ বা শঙ্খবিষ মুমূর্ষু রোগীর জীবন দান করে,

অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় উহা স্পর্শ করিতেও ভয় হয়; এই সমুদয় মাদক দ্রব্য ঠিক ঐ প্রকার। উহা স্বাভাবিক সুস্থাবস্থায় সকলের পক্ষেই বর্জ্জনীয়। যদি কেহ কোন কারণে মাদকের বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ক্রমান্বয়ে উহা পরিত্যাগে যত্নবান্ হইবেন। পানীয় সম্বন্ধে যেরূপ বিবৃত হইল, খাদ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ পবিত্রতা রক্ষার জন্য সাবধান হওয়া উচিত। খাদ্য মাত্রেই টাট্কা হওয়া উচিত; পর্য্যুষিত অর্থাৎ বাসি দ্রব্য; অন্য কোন মনুষ্য বা প্রাণী কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট, বা কাহার ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য অপবিত্র এবং সর্ব্বস্থলেই পরিত্যজ্য। এ ভিন্ন পিতৃপুরুষ-বিগর্হিত অর্থাৎ যাহা পিতৃপুরুষ অপবিত্র বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন; যথা, মুসলমানের পক্ষে শূকর মাংস, হিন্দুর পক্ষে গোমাংস ও কুক্কুটাদি পক্ষীমাংস ব্যবহার করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। যে সমুদয় খাদ্য রজঃ ও তমঃ গুণের উত্তেজক সত্ত্ব গুণের হানিজনক, সে খাদ্যও অপবিত্ররূপে পরিত্যজ্য। যেমন্ সাধারণতঃ সকল প্রকার মাংস। চিকিৎসা শাস্ত্রে মাংসের যথেষ্ট গুণ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা মাংসস্থিত শরীর রক্ষণোপযোগী উপাদানের সহিত, উদ্ভিদ্ জাতীয় মুগ, মসূর, ছোলা, গোধূম ইত্যাদির উপাদানের তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ সমুদয় নিরামিষ খাদ্য মাংস অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। সেই জন্যই বর্ত্তমান সময়ে, ব্রথ অপেক্ষা মুগ মসূরের ক্বাথের অধিক আদর দেখা যাইতেছে। বিশেষতঃ মসূরের ক্বাথ "এসেন্স অব মসূরী" নাম ধারণপূর্ব্বক শিশিতে উঠিয়া বিক্রীত হইতেছে। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতে মাংসরসে উৎকৃষ্ট উপাদান অধিক পরিমাণে থাকিলেও

উহা কেজিন নামক পদার্থে পরিণত হইয়া মূত্রের সহিত বহির্গত হইয়া যায়। কিন্তু নিরামিষ খাদ্যের উৎকৃষ্ট উপাদান যাহা, তাহা কোন মতে নষ্ট হয় না। স্থায়ীভাবে শরীর রক্ষার সহায়তা করে। অনেকের মতে মাংসের ক্বাথে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু উদ্ভিজ্জের ক্বাথের যে এরূপ শক্তি নাই, ইহা কি কেহ পরীক্ষা করিয়াছেন। বরং রক্তামাশয়, বিস্ফোটকাদি কোন কোন রক্তের পীড়ায় মাংস ব্যবহার ইউরোপীয় চিকিৎসকেরাই নিষেধ করিয়াছেন। রোগেই মনুষ্যের প্রাণনাশ করে। রোগমুক্ত হইলে মাংসের ক্বাথের সহায়তা না লইলে সে যে জীবনীশক্তি অভাবে মারা যাইবে, ইহা সম্ভবপর নহে। অনেক ভয়ানক দুর্ব্বলাবস্থাপন্ন রোগীকে মসূরীর ক্বাথ পান করিয়া জীবনীশক্তি লাভপূর্ব্বক আরোগ্য লাভ করিতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এ ভিন্ন আমি কয়েকটা টাইফয়েড ও নিউমোনিয়াগ্রস্ত রোগীকে মুহুর্মুহু ব্রাণ্ডিসহ ব্রথ পান করিয়া বিপরীত ফল লাভ করিতে দেখিয়াছি। তাহাতে আমার এরূপ ধারণা জন্মিয়াছে, মাংস ব্যবহার সকল দেশবাসীর পক্ষে সকল অবস্থায় অনাবশ্যক না হইলেও কোন দেশবাসীর বা কোন ব্যক্তির পক্ষে অপরিহার্য্য-রূপে ব্যবহার্য্য; বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্য নহে। উহাতে এমন কোন উপাদান নাই বা উহার এমন কোন গুণক্রিয়া নাই, যাহার অভাবে মানুষ জীবন ধারণে অসমর্থ হয়। অথবা উহার কোন উপাদানের পরিবর্ত্তিত প্রতিনিধি, উদ্ভিজ্জের মধ্যে পাওয়া যায় না, সেইরূপ কোন উপাদান মাংসের মধ্যে আছে। এক্ষণে কি জন্য মাংস নিত্য ব্যবহার্য্য প্রধান খাদ্যরূপে মানবসমাজে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

মাংস বলিতে মনুষ্য, সকল প্রকার পশু ও পক্ষীর মাংস বুঝায়। সাধারণতঃ সকল প্রকার মাংসই আদিম অবস্থায় মনুষ্যেরা ব্যবহার করিতেন। তখন কেবলমাত্র ফলমূলাদি ভিন্ন এখনকার ন্যায় নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ খাদ্যের আবিষ্কার হয় নাই। তখন তাঁহারা তীর ধনু লইয়া বনে বনে ভ্রমণপূর্ব্বক শিকারলব্ধ পশুপক্ষীর মাংস দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করিতেন। তাহাতে শৃগাল কুক্কুরাদি কোন জন্তুর মাংস বাদ যাইত না। মহাভারতে কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভোজনের গল্প পাওয়া যায়। এখন যেমন পার্ব্বত্য অঞ্চলবাসী অসভ্য জাতীয়েরা আমাদের দেশে আসিয়া শিয়ালাদি দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে, সাপুড়িয়ারা সর্প ভক্ষণ করে, তখন বোধ হয় অধিকাংশ মানব ঐরূপ ছিল। ঐরূপ ভাবে খাদ্য সংগ্রহপূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা তাঁহাদের অভ্যাসগত হইয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রে নরমেধ, অশ্বমেধ, গোমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণ ও পুত্রমাংস দ্বারা দাতাকর্ণের অতিথি সৎকারের বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, তখন খাদ্য-রূপে সকল প্রকার মাংসই গৃহীত হইত। ক্রমান্বয়ে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ হইয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ নরমাংস, গোমাংস, অশ্বমাংস ইত্যাদি হিন্দুরা পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু মুসলমান ভ্রাতারা গোমাংসটা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। পারিলেন না এইজন্য, মুসলমান ধর্ম্মটা আমাদের এদেশের ধর্ম্ম নয়। ইহা সেই মরুপ্রধান পর্য্যাপ্ত শস্যবিহীন আরব দেশীয় ধর্ম্ম। আরবে এই খাদ্য শস্যের অপ্রাচুর্য্যতা নিবন্ধন, সেই একেশ্বরবাদী মুসলমান ধর্ম্মের নেতা মহাত্মা মহম্মদ মাংস ত্যাগের ব্যবস্থা দিতে পারেন নাই। এই অভাবই তাঁহাকে বাধা

দিয়াছিল। নতুবা তিনি যেরূপ প্রেমিক ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই মাংস ব্যবহারের খর্ব্বতা সাধনপূর্ব্বক জীবহত্যা নিবারণ করিতেন। প্রবল পরাক্রমশালী মুসলমান জাতি, যখন আরব দেশ হইতে আসিয়া বাহুবলে ভারত অধিকার করেন, তখন ভোগবিলাসের ক্রোড়ে নিদ্রিত দুর্ব্বলচিত্ত হিন্দু-সন্তানগণ দলে দলে রাজধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। এইরূপেই ভারতে মুসলমানগণের প্রতিষ্ঠান হইয়াছিল। কাযেই তাঁহাদের সেই স্বধর্ম্মোচিত খাদ্য পরিধেয়াদির শৃঙ্খলা স্থাপনে যত্নবান হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইল। কিন্তু তাঁহারা নিজে ভারতবাসী হইয়া যে সম্পূর্ণ বিদেশীয় ধর্ম্মের সংস্কারের পক্ষপাতিত্ব করিতেছেন, এ বিষয় চিন্তা ও বিবেচনা করিবার সময় ও সুযোগ পান নাই। ভবিষ্যতে যদি কখনও তাঁহারা শাস্ত্রীয় অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বাধীন চিন্তা ও বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই গোমাংস ব্যবহারের খর্ব্বতা সাধন হইবে; ইহা আশা করা যায়। এক্ষণে দেখা যাউক, ভারতীয় হিন্দু জাতি কি জন্য গোমাংস ত্যাগ করিলেন। প্রথমতঃ, ভারত শস্যশালী দেশ, এখানে ভূমিকর্ষণের জন্য গোজাতির সাহায্য গ্রহণ বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, গোদুগ্ধ ও তদুৎপন্ন ঘৃত প্রভৃতি, ভারতের প্রধান খাদ্য পানীয়রূপে পরিগণিত। স্তন্যবঞ্চিত শিশুগণ কেবলমাত্র গোদুগ্ধের উপর নির্ভর করিয়া জীবন রক্ষা করে। সুতরাং এইরূপ পরমোপকারী জন্তু খাদ্যরূপে গৃহীত হইলে অচিরে ধ্বংস হইয়া লোপ হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। তৃতীয়তঃ, গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীদিগের পক্ষে গোমাংস কেবল অনাবশ্যক নহে, যথেষ্টরূপ অপকারীও বটে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আছে, গ্রীষ্মপ্রধান

দেশবাসীদিগের গোমাংস ব্যবহারে অগ্নিরোহিণী নামক দুষ্ট বিস্ফোটক জন্মিতে পারে। যাহা হউক, উহা যে গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবাসীর পক্ষে অপকারী এবং অপর বহুবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বে, উহা যে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই কারণেই ভারতবাসীরা ইহাকে অপবিত্র খাদ্যরূপে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বর্জ্জন করিয়াছিলেন। এক্ষণে ছাগ মেষাদি পশু ও বিবিধ পক্ষী মাংসের কথা বলা যাইতেছে।

প্রাচীনকালে মানবের আদিম বর্ব্বরাবস্থায় মাংসই প্রধান খাদ্যের স্থান অধিকার করিয়াছিল; তাহার প্রধান কারণ এই যে, তখন সুপক্ক ফল ব্যতীত কোন নিরামিষ খাদ্যের প্রচলন হয় নাই, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। মানব প্রথমতঃ শস্যের মধ্যে যব ও তিলকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; তৎপরে তণ্ডুল, গোধুম, ছোলা, মুগ ইত্যাদির আবিষ্কার ও খাদ্যরূপে গ্রহণ ও প্রচলন করিতে মানবের বহুকাল লাগিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে মানবের খাদ্যের অভাবই দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য করিয়া রাখিত। তাঁহারা খাদ্য পানীয়ের গুণক্রিয়া ও উপকারিতার বিষয় চিন্তা করিবার সময় পাইতেন না। কেবল উদর পূরণের জন্যই তাঁহাদিগকে নিয়ত বিব্রত থাকিতে হইত। কারণ, কেবলমাত্র জান্তব খাদ্য ও পক্ক ফল দ্বারা প্রতিদিন ক্ষুধা নিবারণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ক্রমে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ উদ্ভিজ্জ খাদ্যের আবিষ্কার ও প্রচলন হওয়ায় মানব পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা শান্তিলাভ করিয়া খাদ্যের দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রমান্বয়ে জান্তব খাদ্য ও তন্মূলক

জীবহিংসাকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তখন মানবের পাপ-পুণ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট বোধ ক্রমান্বয়ে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সেই সময়ে ভোগবিলাসের ক্রোড়ে পালিত, মাংসপ্রিয় রাজার পুত্র বুদ্ধ নামধারী কোন মহাপুরুষ হিংসামূলক মাংসাদি খাদ্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অহিংসামূলক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তৎপরে মাংস ব্যবহারের পক্ষপাতী ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মাংস ভক্ষণ ও পশুহননের বিরুদ্ধে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া মাংস ভক্ষণের খর্ব্বতা সাধন করিয়া দিলেন। হিন্দুর পঞ্চম বেদ মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে মাংস ভক্ষণের তীব্র প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত হইয়াছে, ধর্ম্মপিপাসু হিতকামী ব্যক্তিগণ, পুত্র মাংস তুল্য পশু মাংস, কদাচ ভক্ষণ করিবে না। মাংস ত্যাগে মহৎ ফল লাভ হয়।" এ ভিন্ন চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাদির ব্যবস্থা মাংস ভক্ষণের নিষেধ-সূচক নিয়মের অন্তর্গত। হিন্দুর নিত্য ব্যবহার্য্য দিন পঞ্জিকা, যাহা দেশের উচ্চতম পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া সাধারণের নিকট আদৃত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে মাসের মধ্যে অন্ততঃ পনর দিন মাংস ভক্ষণে নিষেধ করা হইয়াছে। কোন দৈব বা পৈত্রিক শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে, উপনয়নে, বিবাহে, অন্নপ্রাশনাদি শুভকার্য্যে অনুষ্ঠানকারীকে মাংস ভক্ষণ হইতে বিরত থাকিতে হয়। এ প্রথা চিরকাল প্রচলিত আছে। এই সমুদয় অতীত ও বর্ত্তমান কালের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মাংসের অপকারিতা যথেষ্টরূপ আছে; সেইজন্য উহা পুনঃ পুনঃ জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া আসি

তেছে। ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মানব প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম এই যে, যখন যাহার সঙ্গলাভ করা যায়, তখন তাহার দোষগুণের ভাগী হইতে হয়। আর যাহা ভক্ষণ করা যায়, তাহার সম্বন্ধেও বোধ হয় ঐ নিয়ম কিয়ৎ পরিমাণে খাটিতে পারে।

একটী প্রকাণ্ডকায় পশুকে ভক্ষণ জন্য বধ করিতে হইলে আপনার হৃদয়ের দয়া, মমতা, স্নেহ ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বৃত্তিসমূহ বিসর্জ্জন দিয়া, নিষ্ঠুরতারূপ পাপ প্রবৃত্তিকে সঙ্গে লইয়া উহার বধ কার্য্য সমাধা করিতে হয়। ইহাতে যে অন্তঃকরণ অপবিত্র ও তামসিক ভাব ধারণ করে, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রভূত মাংসভোজীদিগকে অত্যন্ত কাম ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হইতে হয়। ইহাতে মানবের নিকৃষ্ট বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উৎকৃষ্ট বৃত্তিকে পরাজিত করতঃ মানবকে হিংস্র স্বভাবাপন্ন করে। সুতরাং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে যাইতে হইলে মাংস ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে এই অপবিত্রতার আকরস্বরূপ মাংস ভোজন ব্যাপারটা কিরূপে বলিদান বা কোর্ব্বাণীরূপে ভারতীয় লোকের ধর্ম্ম কার্য্যের অঙ্গীভূত হইল, সেই সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

বলিদান বা কোর্ব্বাণীসংযুক্ত উপাসনা প্রণালী আমাদের ভারতবর্ষেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টানদিগের উপাসনা প্রণালীতে বলিদানের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ মানবের ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস পূর্ব্বাপর থাকিলেও তিনি যে কোথায় কি ভাবে থাকিয়া কি করিতেছেন, না করিতেছেন, এই তর্ক মানুষের মনে আদিমকাল হইতেই

উঠিয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই ইহার নানা প্রকার কল্পিত ও সত্য মীমাংসা হইয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালে মানবগণ প্রাকৃতিক শক্তিপ্রসূত অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবাত, বজ্রাঘাত, জলপ্লাবন, দাবানল ইত্যাদি দেখিয়া ভয়ে কম্পিত ও বিত্রস্ত হইয়া ঐ সমুদয় পৃথক পৃথক ভয়ঙ্কর ব্যাপারের পৃথক পৃথক দেবতা কল্পনাপূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা, অর্চ্চনা, স্তুতি, মিনতি দ্বারা অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা শান্তি পাইলেন না। কারণ, তাঁহাদের একটী দুর্জ্জয় শত্রু সম্মুখে উপস্থিত হইল; উহার নাম মহামারি বা মড়ক। অর্থাৎ কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি সংক্রামক রোগ কর্ত্তৃক অকস্মাৎ জনপদ ধ্বংসপ্রাপ্তি। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় অকস্মাৎ কোথা হইতে এই সকল সংক্রামক ব্যাধি আসিয়া অল্প সময়ের মধ্যে আবালবৃদ্ধবণিতা নির্ব্বিশেষে বহু লোক গ্রাসে করিয়া চলিয়া গেল। শোকসন্তপ্ত জনকজননিগণের আকাশভেদী আর্ত্তনাদে পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। তাঁহারা ইহা দেখিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এ কি ভয়ানক ব্যাপার! প্রাতঃকালে যাহার সহিত হাস্য তামাসা করিতেছিলাম, বৈকালে সে প্রজ্বলিত চিতানলে দগ্ধ হইয়া আকাশে বিলীন হইল। ইহার পশ্চাতে কে আছেন? বহু চিন্তা ও অনুসন্ধানের ফলে ঠিক করিলেন যে, ইহা বোধ হয়, কোন হিংসাময়ী শক্তির রোষকটাক্ষপাতের ফল। সেই ক্রোধোন্মত্তা মনুষ্যরক্ত-পিপাসু, স্বেচ্ছাচারিণী সংহারিণী শক্তির তীব্র কটাক্ষে যিনি যখন পতিত হইবেন, তাঁহাকে তখনই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে। অতএব তাঁহার এই

অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, তাঁহার অভিলষিত দ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক স্তুতি মিনতি করা ভিন্ন আর উপায় নাই। যখন অবিচারে, বিনা অপরাধে বহু লোকের প্রাণ বিনাশ করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই মনুষ্য রক্তে তাঁহার লোভ আছে। তন্নিবারণার্থ তাঁহার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে আহ্বান করতঃ তাঁহার সম্মুখে কোন নর কি পশু বলিদানপূর্ব্বক তাঁহাকে তাহার রক্তপান করিতে অনুরোধ করিলে তিনি আসিয়া সেই রক্তপান করতঃ তৃপ্ত হইবেন। নরবলিটা অবশ্য সুসভ্য ইংরেজাধিকারের আমল হইতে উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ পশুবলির ব্যবস্থা আছে। ইহাতে দুইটী উদ্দেশ্য সফল হইতেছে। প্রথমতঃ, ক্রোধোন্মত্তা দেবীকে রক্তদানপূর্ব্বক সন্তুষ্ট রাখিয়া আত্মরক্ষা করা; দ্বিতীয়তঃ, নিহত পশুর মাংস ভক্ষণ করিয়া আস্বাদন স্পৃহাকে চরিতার্থ করা; এই শেষোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই বলিদানের ব্যাপারটা অদ্যাপি এই সভ্যতার যুগে ধর্ম্ম কার্য্যের অঙ্গীভূত রূপে, মাংসপ্রিয় মানব কর্ত্তৃক আদৃত ও রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ধর্ম্মকার্য্য নহে, পরন্তু অধর্ম্ম কার্য্যই বটে। ইহা কল্পিত মনস্তুষ্টিজনক ও ভয়নিবারক ক্রিয়ামাত্র। ঈশ্বরোপাসনার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধই দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক্ষণে মাংস ভোজনের অনাবশ্যকতা ও অপকারিতা বিষয়ক কতকগুলি যুক্তিসিদ্ধ মীমাংসা ইউরোপ দেশীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগের মত আলোচনা করিয়া পাঠককে দেখাইব।

ইউরোপ দেশীয় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক "সিড্‌নী এইচ বিয়ার্ড" নামক কোন পণ্ডিত তাঁহার স্বরচিত কোন গ্রন্থে "মানবজাতির

বিজ্ঞানসম্মত কিরূপ আহার হওয়া উচিত” তাহা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে মানবকে নিরামিষ ভক্ষণ করাই উচিত। উদ্ভিজ্জ খাদ্যই মানবের স্বাভাবিক খাদ্য। এই বিধি না মানিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক মাংস ভক্ষণ করিলে নানা প্রকার রোগ ও অকাল বার্দ্ধক্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধ্যাপক “বেরণ কিউভার” বহু পরীক্ষার পর নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রচার করিয়াছেন যে, শারীর বিজ্ঞানানুযায়ী মানব শরীরের গঠনপ্রণালী দেখিয়া উহা যে উদ্ভিজ্জ খাদ্য ফলমূল আহারের উপযোগী, ইহাই প্রমাণিত হয়। মাংসাহারী জীবের সহিত মানবদেহের কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। ডাক্তার জোষিয়া ওল্ড্ ফিল্ড্ জীবনব্যাপী অনুধাবনের পর বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান স্পষ্টই প্রমাণ করিতেছে যে, মানব মাংসাহারী জীব নয়, পরন্তু ফলমূলভোজী জীব। ফলমূল শাক্-শব্জীতে যে উপাদান আছে, মানব শরীরের পক্ষে উহাই যথেষ্ট। মাংস অস্বাভাবিক খাদ্য, এইজন্য উহা ব্যবহারে পাকস্থলীর নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন করে এবং যে সার ধাতু দ্বারা দেহের শ্রীবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভ হয়, সেই বস্তুর তেজ মাংসাহারে নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে মানবের আয়ু আরও কমিয়া যায়। শতকরা ৯৯ জন মাংস ভক্ষণ জন্য নানাবিধ কঠিন রোগে ভুগিয়া থাকে। কর্কট রোগ, ক্ষয়-রোগ, দূষিত জ্বর, দদ্রু, কুষ্ঠ প্রভৃতি আমিষাশীদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধরূপে দেখা যায়।

ইংলণ্ডের একজন বিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসক ডাক্তার “হেগ” তাঁহার প্রণীত “ইউরিক এসিড্ ও রোগের নিদান” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, একমাত্র ইউরিক্ এসিড্ হইতে গেঁটে বাত,

পক্ষাঘাত, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বিবিধ বায়ুরোগ, মানসিক দুর্ব্বলতা, যকৃৎ রোগ, বহুমূত্র ইত্যাদি নানাপ্রকার জটিল রোগ উৎপন্ন হয়। কোন্ খাদ্যে কি পরিমাণ ইউরিক্ এসিড্ আছে, তাহা সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার হেগ প্রকাশ করিয়াছেন যে, অর্দ্ধ সের গোমাংসে ১৪ গ্রেণ ও উহার অর্দ্ধ সের যকৃতে ১৯ গ্রেণ ইউরিক এসিড্ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে উদ্ভিজ্জ খাদ্যে ইউরিক্ এসিড্ নাই বলিলেও চলে। উক্ত ডাক্তারের মতে মানব দেহে বহুবিধ রোগ একমাত্র ইউরিক এসিড ভক্ষণে উৎপন্ন হয়। আর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত "রবার্টস্ পাকস্" দেখাইয়াছেন যে, মাংসে এমন এক প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য আছে, যাহা ধীরে ধীরে দেহে সঞ্চিত হইয়া দেহকে একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। প্রথমে পাকস্থলীর গোলযোগ এবং ক্রমে দৈহিক যন্ত্রের অবনতি ঘটিয়া দেহটা ব্যাধির লীলাক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়া পড়ে। ঐ চিকিৎসকের মতে হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি বহুবিধ রোগের একমাত্র কারণ মাংসজ বিষাক্ত লবণ। ডাক্তার পার্চেট, ডাক্তার লক্স্ প্রমুখ বহু চিকিৎসক তাঁহাদিগের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতায় এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, দুরারোগ্য অন্ত্রোপাঙ্গ নামক প্রদাহ রোগের একমাত্র কারণ মাংসাহার। নিরামিষাশীদের মধ্যে এই রোগ কখনও দেখা যায় না। এই সমুদয় বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাইব যে, তৃণভোজী ছাগ, অশ্ব, মেষ, মহিষ, গো প্রভৃতির তুলনায় মাংসভোজী ব্যাঘ্র, মার্জ্জার, শৃগাল, কুক্কুর প্রভৃতি জন্তুদিগের কতকগুলি দৈহিক বিশিষ্টতা আছে; যথা, মাংসাশী প্রাণীদের দন্তসমূহ সূক্ষ্মাগ্র, তীক্ষ্ন, ধারাল; তৃণভোজীদিগের দন্ত ওরূপ নহে। মাংসাশী-

দিগের দন্তসমূহ ফাঁক ফাঁক এবং এমন ভাবে অবস্থিত যে মুখ বন্ধ করিলে উপর চোয়ালের দন্তপাটীর ফাঁক মধ্যে নিম্নের দাঁতগুলি ঢুকিয়া পড়ে। ইহা মাংস টানিয়া ছিঁড়িয়া খাইবার উপযোগী, নিরামিষাশী জীবদিগের দন্তপাটী ঘনসন্নিবিষ্ট, খাদ্যদ্রব্য পিষিয়া খাইবার উপযোগী। মাংসাশীদিগের নাসারন্ধ্রের ঠিক নিম্নে কয়েক গাছি দীর্ঘ কেশ থাকে, তৃণভোজীদিগের ওরূপ নাই। মাংসাশীদিগের নখসমূহ তীক্ষ্ণাগ্র, ধারাল প্রাণী হত্যার উপযোগী, নিরামিষাশী প্রাণীদিগের নখ ধারাল নহে। মাংসাশী প্রাণীদিগের কয়েকটী বিশেষত্ব যাহা দেখান হইল তৎসমুদয়ের মধ্যে কোন চিহ্নই মনুষ্য দেহে পাওয়া যায় না। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, নিরামিষাশী বিধবা ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং সাধু সন্ন্যাসিগণ প্রায়ই দীর্ঘজীবী ও নীরোগ হইয়া থাকেন। জগতের শ্রেষ্ঠ মনিষীগণের নাম সংগ্রহ করিলে দেখা যায়, তাঁহারা অধিকাংশই নিরামিষাশী ছিলেন। পিথেগোরাস, প্লেটো, আরিষ্টোটল, সক্রেটীস, হাইপেটীয়া, সেপেকন, জেরোষ্টর, মিল্‌টন, নিউটন, ফ্রাঙ্কলিন, ওয়েলিংটন ইত্যাদি ইউরোপ দেশীয় মুনি-ঋষিগণ নিরামিষাহারী ছিলেন। ভারতীয় সাধু মহাত্মাগণ যথা, বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, নানক, প্রতাপ, শিবাজী প্রভৃতি সকলেই নিরামিষাশী ছিলেন।

পবিত্র স্বরূপের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, এজন্য পাঠক ধৈর্য্য নষ্ট করিবেন না; এক্ষণে পুনরায় আমাদিগের সেই পবিত্র স্বরূপের কথা স্মরণ করা যাউক। সর্ব্বাঙ্গীন পবিত্রতা রক্ষণপূর্ব্বক পবিত্র স্বরূপের আদেশ পালন করিতে হইলে, কেবল পান ভোজন

স্নানাদিতে সাবধান হইলে চলিবে না, এইজন্য সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে এবং সকল ইন্দ্রিয়ের হেড্ আফিসস্বরূপ মনের পবিত্রতা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে হইবে। মনের কার্য্য মনন করা অর্থাৎ ইচ্ছা করা ও চিন্তা করা। অতএব সর্ব্বদা ইচ্ছিত ও চিন্তিত বিষয় সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে। কোন নিকৃষ্ট, ঘৃণিত ও কলুষিত বিষয়ে ইচ্ছা বা চিন্তা করিলে মন অপবিত্র হয়। অতএব মনে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে দেখিতে হইরে উহা পবিত্র কি না? উহা কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহায় কি না? আমার জীবনের উন্নতির বিরোধী কি না? অর্থাৎ আত্মার উপকারী কি অপকারী। যদি অপকারী হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা মন হইতে বিদায় দিয়া ঈশ্বরের স্মরণপূর্ব্বক পবিত্র হইবে। তরলমতি অপরিণামদর্শী যুবকগণ সতত রমণীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া স্বপ্নদোষাদি কুৎসিৎ রোগের সৃষ্টি করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন। অতএব সর্ব্বদা চিন্তনীয় বিষয় সম্বন্ধে বিশেষরূপে সাবধান হইতে হইবে। মনে ইচ্ছা হইল তাস খেলি; কিন্তু দেখিতে হইবে, বিবেক কি বলেন। বিবেক বলিতেছেন, বহু দায়িত্বপূর্ণ স্বল্পস্থায়ী অপূর্ণতাযুক্ত মানবজীবনে বৃথা সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই। যাহাদিগকে আজীবন জ্ঞানোপার্জ্জন ও শিক্ষালাভ করিয়াও শেষ হয় না, তাহাদের জন্য বৃথা সময় নাই। অতএব অনাবশ্যক চিন্তা বা কার্য্য, সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। আমাদিগের ব্যক্তিগত আমিত্বের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সর্ব্বদা সেই মহা আমিত্বের অধীন হইয়া চলিতে হইবে। আমিত্বের ঈশ্বরানুগত্যতাই প্রকৃত স্বাধীনতা, যথেচ্ছচারিতা স্বাধীনতা নহে; উহা প্রবৃত্তি ও আসক্তির দাসত্বমাত্র। চিত্তের

কার্য্য ধারণা করা অর্থাৎ কোন বিষয় স্মৃতিপথে আয়ত্ত করিয়া রাখা। অর্থাৎ জমাইয়া রাখা। চিত্ত যেন আমাদের জ্ঞানের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার; আমরা যেখান হইতে যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া অভিজ্ঞতা লাভ করি, তাহা চিত্তে অঙ্কিত করিয়া রাখি। এই চিত্তই মানব চরিত্রের ভিত্তিভূমি ও আদর্শের কষ্টিপাথরস্বরূপ। এই চিত্তরূপ কষ্টিপাথরে অভিজ্ঞতাজনিত অসংখ্য আদর্শ বা নমুনা অঙ্কিত থাকে; সেই নমুনার সহিত মিল করিয়া বুদ্ধি উপস্থিত বিষয়ের প্রতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়পূর্ব্বক অবস্থা বিশেষে গ্রহণ বা বর্জ্জন করে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদের এই চিত্তরূপ কষ্টিপাথরখানি সর্ব্বদা নির্ম্মল ও পবিত্র রাখিতে হইবে। কুৎসিৎ বা অনাবশ্যক বিষয় বা আদর্শকে চিত্তে স্থান দেওয়া হইবে না; এইজন্য প্রহরীস্বরূপ আমাদের অন্তরের অন্তর্যামী, পরম পবিত্র স্বরূপকে স্থায়ীভাবে চিত্তমন্দিরে ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে এবং তিনি যেন এক পলকের জন্য চিত্তমন্দির হইতে অন্তর্হিত না হন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি স্থায়ীভাবে তাঁহাকে চিত্তমন্দিরে ধারণা করিয়া রাখিতে না পারা যায়, তাহা হইলে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে উপাসনা দ্বারা তাঁহাকে স্মরণপথে রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। স্বর্ণকারেরা যেরূপ সমস্ত দিন তাঁহাদের কষ্টিপাথরস্থিত নমুনার সহিত বিবিধ প্রকার স্বর্ণ কষিয়া দেখিয়া ক্রয় বিক্রয় করতঃ দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পরদিন আবার পাথরখানি মাজিয়া তাহার পূর্ব্ব দিনের মলিনতা-পূর্ণ কষগুলি দূর করতঃ পুনরায় পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করিয়া লয়েন, আমাদের চিত্তকেও ঐরূপ সাংসারিক বিষয় সংস্পর্শজনিত মলিনতা, দৈনিক উপাসনা দ্বারা দূর করিয়া পরিষ্কার ও উজ্জ্বল

করিয়া লইতে হইবে। ইহাই হইল পবিত্রতা রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়; এইজন্য সকল ধর্ম্মে, সকল সম্প্রদায়ে বিশেষ বিশেষ প্রণালীতে নিত্য উপাসনার ব্যবস্থা। সমুদয় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারে পবিত্রতা রক্ষার জন্য আমাদের বিবেককে প্রহরী স্বরূপ রাখিতে হইবে। ইন্দ্রিয় সংস্পর্শে যখন যে বিষয় দৃষ্ট, শ্রুত ইত্যাদি যে কোন প্রকারে আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হইবে, তাহাকে পবিত্র ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। যিনি স্বয়ং চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া সমুদয় ইন্দ্রিয়কে বিবেকের অধীনে পরিচালিত করিতে পারেন, সমুদয় জগৎ তাঁহার নিকট পবিত্র হয়। অপবিত্র তাঁহার নিকট হইতে আপনিই পলায়ন করে। তাঁহাকে স্পর্শ করিতে বা তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে পারে না। তাই কোন সাধু বলিয়াছেন, "হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গিলে হাতে আঠা লাগে না।" ইহার ভাবার্থ এই যে, যিনি জ্ঞান বিবেকরূপ তৈল দ্বারা আপনার অন্তঃকরণ ও সমুদয় ইন্দ্রিয় দ্বারকে সিক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে সংসারের কোন অপবিত্র পাপ প্রলোভন স্পর্শ করিতে পারে না। মানবাত্মা অর্থাৎ মানবের ব্যক্তিগত আমিত্ব, কাহারও স্বভাবতঃ অপবিত্র নহে। আত্মার জাতি নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণের আত্মা যেরূপ পবিত্র, শূদ্রের আত্মাও সেইরূপ, চণ্ডালের আত্মাও সেইরূপ পবিত্র। অতএব হীন বংশোদ্ভব বা হীন জাতি বলিয়া কেহ যেন হতাশ্বাস হইয়া আত্ম-গ্লানি না করেন। তাহাতে স্বাধীন মানবাত্মার অবমাননা করা হয়। উৎকৃষ্ট চরিত্রবান্ জ্ঞানীর আত্মা স্বভাবতঃই পবিত্র। তা সে ব্যক্তির জাতি বা উপাধি যতই হীন হউক তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সাধারণের চক্ষে তাহার আদর ও সম্মান না

থাকিলেও জ্ঞানীর চক্ষে সে প্রকৃত মানুষ। তাহার জীবন মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট আদর্শমূলক। আত্মা যখন অজ্ঞানতার আবরণে আবৃত হয়, তখন সে অপবিত্র হয়; তা সে মহা ব্রাহ্মণ সন্তান হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। আবার যখন আত্মা অজ্ঞানতার আবরণ হইতে মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল হয়, তখন সে স্বপ্রকাশরূপে পবিত্রতার আলোকরশ্মি বিস্তার করে।

অতএব পবিত্র স্বরূপের আদেশ পালনরূপ সার্ব্বাঙ্গিক পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে, অনন্ত আশার আলোকে আপনার ব্যবহার ও চরিত্রের যতদূর সম্ভব উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান্ হইতে হইবে। যাঁহার অন্তঃকরণ পবিত্র, তিনি ব্যভিচারিণী বারাঙ্গনাকেও মাতৃভাবে তাঁহার পবিত্র দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন। কারণ, তিনি জানেন যে, রমণী জননশক্তির আধাররূপিণী, সুতরাং মাতৃশক্তি। উহা যখন যে ভাবে যে অবস্থায় দৃষ্টিপথে পতিত হউক, তাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তি বিচলিত হয়েন না। ঐরূপ দৃশ্য দর্শনে, অজ্ঞান ও অপবিত্র চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিই, রূপজ মোহে মুগ্ধ হইয়া দীপালোকে পতঙ্গ পতনের ন্যায় বিপদাপন্ন হইয়া থাকেন। আত্মার সংস্পর্শে ভোগ্য বস্তু পতিত হইলে, ভোগস্পৃহা উপস্থিত হয়, তাহাতে আত্মহারা হইয়া অধিকার, অনধিকার, যোগ্যতা, অযোগ্যতা বিচার না করিয়া সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলে, বড়শীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় বিপন্ন হইতে হয়। অতএব উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে পবিত্র অন্তঃকরণে নির্ম্মল বুদ্ধি সহযোগে বিচারপূর্ব্বক কর্ত্তব্য পালন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে হইবে। কাম, ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হইয়া আপনার বিবেকের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া মোহান্ধ হইবে না। যাহাতে মনোবিকার উপস্থিত

না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। সর্ব্ব প্রকার কুসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কুলোকের সহিত একত্র বাস ও তাহাদের সহিত ধর্ম্মবিরোধী অপবিত্রকর আলাপ ব্যবহার ত্যাগ করিতে হইবে। কুশব্দ অর্থাৎ কুৎসিৎ সঙ্গীতাদি ও অসৎ প্রসঙ্গ শ্রবণ বা পঠন, অপবিত্র, ঘৃণাবিদ্বেষজনক ইন্দ্রিয় ও আসক্তির উত্তেজক বস্তু দর্শন ও অপবিত্র স্পর্শনাদি সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধচিত্তে, সরলান্তঃকরণে সেই পরম পবিত্র স্বরূপকে অন্তর রাজ্যের সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার আজ্ঞাবহ হইতে হইবে। ইহাই হইল, মানবের ব্যক্তিত্বের দিক হইতে পবিত্রতা রক্ষার উপায়।

ইহা ভিন্ন আর একটী দিক্ আছে, তাহার নাম সমাজ। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিসমূহের সমষ্টিগত ভাব ও ব্যবহার প্রণালীকে সমাজ বলে। ব্যক্তিসমূহের পবিত্রতা রক্ষা হইলে সমাজও পবিত্র হয় বটে, কিন্তু সামাজিক প্রথা যাহা সাধারণের অজ্ঞাতসারে বা শৈথিল্যে অথবা সামাজিক নেতাগণের স্বার্থ প্রণোদিত ব্যবস্থার দোষে একবার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহা অতি অপবিত্র ও ঘৃণিত হইলেও ব্যক্তিবিশেষ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অতিশয় আলস্য বোধ করেন বা হস্তক্ষেপ পূর্ব্বক বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। এইজন্যই কোন সামাজিক দুর্নীতির মূলচ্ছেদ, সংস্কার বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে বহু ব্যক্তির সহানুভূতির আবশ্যক হয়। দুই এক ব্যক্তি ইহাতে চেষ্টা করিলে তাঁহাদিগকে সমাজের নিকট হাস্যাস্পদ, ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হইয়া বিফল মনোরথ হইতে হয়। যদিও প্রাচীনকালে রাজা রাম-মোহন রায় সতীদাহ, নরবলি ইত্যাদি ভীষণ কুপ্রথার বিরুদ্ধে

দণ্ডায়মান হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে রাজকীয় সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল এবং রাজবিধি দ্বারাই উহা রহিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু বিধবাদিগের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক দেশ বিদেশে ভ্রমণ করতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে উপদেশ দিয়া এবং সাধারণের জন্য পুস্তক প্রচার করিয়া হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে পারেন নাই। এই সমুদয় দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সামাজিক কুপ্রথা নিবারণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। উহা বহু ব্যক্তির একতা-মূলক শক্তি প্রয়োগ ভিন্ন সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। কিরূপে এই বিধবা নির্য্যাতন ব্যাপারটা সমাজে অপবিত্রতার স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে এই ধর্ম্মগ্রন্থখানি কলঙ্কিত হয়, তজ্জন্য সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে। জ্ঞানের চক্ষে দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যায়, সহমরণ প্রথাটা রাজানুগ্রহে নিবারিত হইয়া বিধবাদিগের দেহটা মাত্র রক্ষা পাইয়াছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রবিধির শাসনে তাহারা মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই। তাহাদিগকে মনুষ্যত্বহীন হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া জীবন যাপন করিতে হইতেছে। কেহ মুনি ঋষিদিগের অসাধ্য, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের গুরুভার বহন করিতে না পারিয়া, মানব স্বভাবসুলভ ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় ঘরের বাহির হইয়া মনুষ্যের ঘৃণিত অবস্থার শেষ সীমায় পদার্পণ করতঃ পতিতা গৃহে আশ্রয় লইতেছে। কেহ বা ঘরে থাকিয়া পুনঃ পুনঃ ভ্রূণহত্যাপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া হিন্দু শাস্ত্রের প্রভাব বিস্তারপূর্ব্বক সমাজকে কলঙ্ক কালিমায় ও নরহত্যারূপ মহাপাপে

আচ্ছন্ন করিতেছে। এই সমুদয় পাপের প্রতিকারের ব্যবস্থা প্রাচীন কুসংস্কারাপন্ন গোঁড়াদিগের দ্বারা কখনই আশা করা যাইতে পারে না। তজ্জন্য নব্য শিক্ষিত স্বদেশহিতৈষী যুবকদিগের নিকট আমার প্রার্থনা, তাঁহারা যদি ছলে, বলে, কৌশলে গোঁড়াদিগের মুখ বন্ধ করিয়া ব্যথিত ব্রণে শস্ত্র প্রয়োগের ন্যায় কোন গতিকে হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে পারেন, তাহা হইলে সমাজের এই কলঙ্ক বিদূরিত হয়। কেবল ব্যক্তিগত পবিত্রতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলে পবিত্র থাকা যায় না। সমাজে পাপস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিলে তাহাতে সকলকেই হাবুডুবু খাইতে হয়। এই জন্যই প্রত্যেক মানবকেই সামাজিক পবিত্রতা রক্ষায় যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। সমাজে যে কত প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার, দুর্নীতি আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমাদিগকে কলঙ্কিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিতেছে, তাহা বর্ণনা করিবার স্থান এ গ্রন্থে নাই। তবে স্থূলতঃ যাহা বিবেকের অননুমোদিত, অন্ধ বিশ্বাস ও সন্দেহের উপর স্থাপিত এবং কষ্ট কল্পনা দ্বারা সমর্থিত তাহাতে কিছু না কিছু কুসংস্কার আছেই আছে। অতএব পরিবারবর্গ, জাতীয় সমাজ ও সমগ্র মনুষ্য সমাজ, যাহাতে স্ব স্ব পবিত্রতা রক্ষা করিয়া ব্যক্তিগত ও সমাজগত ভাবে পবিত্র থাকিতে পারে, তাহার অনুকূল চেষ্টাই সেই পবিত্র স্বরূপের প্রকৃত উপাসনা। এক্ষণে আইস পাঠক, আমরা সর্ব্বাগ্রে পবিত্র স্বরূপের নিকট পবিত্রভাবে জীবন যাপনের জন্য সকাতরে প্রার্থনা করি।

প্রার্থনা।

হে নির্ব্বিকার পরম পবিত্রতার আধার পরমেশ্বর! তুমি

আমাদের অন্তরে বাহিরে পবিত্রতা রক্ষা করিবার শক্তি ও সুযোগ প্রদান কর। তুমি যেরূপ নির্ব্বিকার, অপরিবর্ত্তনীয়রূপে সংসারে বিরাজিত আছ, তোমার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও নির্ভর যেন ঐরূপ অপরিবর্ত্তনীয়রূপে বর্ত্তমান থাকে। কোন প্রকার অপবিত্র দুশ্চিন্তা ও অসদভিপ্রায় যেন আমাদের অন্তরে স্থান না পায়, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। আমরা যেন বাক্যে, কার্য্যে, চিন্তায় পবিত্রতা রক্ষা করিয়া তোমার সেবায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি। তুমি পাপী, তাপী, ঘৃণিত, সাধু, সন্ন্যাসী, মোহান্ত সকলের হৃদয়ে সদাকাল সমানভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া তোমার ন্যায়পরতারূপ পরম পবিত্র সংকল্পের পরিচয় দিতেছ। তুমি আমাদিগকে জাতিগত অলীক শূদ্রত্বের নিরাশার অন্ধকার হইতে ব্রাহ্মণত্বের দিকে লইয়া যাও। হে পরম জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশ নির্ব্বিকার! তুমি যাহার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হও, তিনি শূদ্র সন্তান হইলেও প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হন। আর তুমি যাহার হৃদয়ে জাতীয় অভিমান ও অজ্ঞানতার আবরণে প্রকাশিত হইতে পার না, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও প্রকৃত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। হে সকল হৃদয়ের অমূল্য রত্ন! তুমি আমাদিগকে পবিত্র করিয়া তোমার পথে লইয়া যাও। আমরা যেন অন্তরে, বাহিরে, পরিবারে ও সমাজে, বাক্যে, কার্য্যে, চিন্তায় পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারি, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

স্বরূপ তত্ত্ব।

সর্ব্বশক্তিমানং—প্রভু—তিনি সকল শক্তির কেন্দ্র স্বরূপে সকলের মূলে থাকিয়া সকল শক্তিকে নিয়মিত ও পরিচালিত

করিতেছেন; তিনি সকলের প্রভু, তাঁহার উপর আর প্রভু নাই এবং তাঁহার আর দ্বিতীয়ও কেহ নাই; তাঁহার অংশও নাই। তিনিই শক্তিরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রকাশিত থাকিয়া তাঁহার বিচিত্র মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। তিনিই একমাত্র জগতের উপাদান কারণ, সৃষ্টির কারণ।

একমাত্র তাঁহার শক্তিতেই এই জগৎ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। এইজন্য তিনি সকলের প্রভু। আমাদের ব্যবহারিক জগতে মানুষ কর্ত্তাদিগের কর্ত্তৃত্ব করিতে হইলে, তাহার পৃথক কর্ম্ম, উপাদান ও আধার চাই। কিন্তু এ কর্ত্তা সেরূপ নহে। ইনি একেবারে সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহার আশ্রয় উপাদান সকলই তিনি। তিনি ভিন্ন কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। এক্ষণে দার্শনিক যুক্তি মতে একবার সেই সর্ব্বশক্তিমানকে অনুসন্ধান করা যাউক। শক্তিমান ও শক্তি এই দুইটীর দ্বারা জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। ইহা ভিন্ন আর আমরা কিছু দেখিতে পাই না। আমরা যে সাকার নিরাকার বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির খেলা পৃথক পৃথকরূপে অনুভব করি, উহার মূলে একটী শক্তিই বিদ্যমান। আধার ও অবস্থা বিশেষে ভিন্নত্ব বোধ হয়। এই যে বিচিত্রতা, ইহা প্রকাশশীল জগতের স্বভাবগত ভাব। কিন্তু ইহা বিশ্লেষণ করিলে, একে যাইয়া উপস্থিত হইতে হয়। শক্তি ঘনীভূত হইয়া সাকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়; আবার দ্রবীভূত হইয়া নিরাকার অবস্থা লাভ করে। যেমন বরফ ও জল। সুতরাং শক্তিমান্ ও শক্তি, এই দুইটী ভিন্ন আমরা আর কিছুই পাইতেছি না। এক্ষণে এই দুইটীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, ইহাই বিচার্য্য। শক্তি, শক্তিমানের আশ্রিত। শক্তি পরিচালনা করা না করা, সেই

শক্তিমানেরই ইচ্ছাধীন। তিনি তাঁহার শক্তিকে বিস্তারিত, সঙ্কুচিত সকলই করিতে পারেন। অতএব শক্তিমানই শ্রেষ্ঠ। সেই শক্তিমান যে অদ্বিতীয়, তাহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং যে শক্তির দ্বারা জগৎ ধৃত, পরিচালিত, রক্ষিত, সঙ্কুচিত, বিস্তৃত ইত্যাদি নানাভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে; ইহা সেই অদ্বিতীয় শক্তিমানের শক্তির খেলা। একের শক্তি কখনও বহু হইতে পারে না, একের শক্তি এক। কিন্তু বিচিত্র জগদাধারে প্রকাশে বহুত্ব দেখাইতেছে। যেমন এক ব্যক্তি কখন স্বহস্তে হলচালনা করেন, কখন চণ্ডী, গীতা ও গায়ত্রীর ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দুদিগের ধর্ম্ম পিপাসা নিবারণ করেন, কখন কেতাব কোরাণ লইয়া মুসলমানদিগকে উপদেশ প্রদান করেন, কখনও বাইবেলের ব্যাখ্যা করিয়া খৃষ্টানধর্ম্মের গভীর তত্ত্বের মীমাংসা করেন। কখন বিবিধ শিল্প কার্য্য করিয়া, শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করেন, কিন্তু মূলে ব্যক্তি একই এবং তাঁহার শক্তিও এক; প্রকাশে ভিন্নত্ব দেখাইতেছে।

সেই অনন্ত বিশ্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমানের খেলাও ঠিক ঐরূপ। সেই শক্তিই আমাদের বাহুতে বাহুবলরূপে, উদরে পরিপাকশক্তি-রূপে, ভূমিতে উর্ব্বরতাশক্তিরূপে, অন্তঃকরণে বুদ্ধিশক্তি, অগ্নিতে দাহিকাশক্তিরূপে, বরফে শীতলতারূপে, তাঁহার সেই শক্তির মহিমা বিস্তার করিতেছেন। যিনি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণরূপে সকলকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, তিনিই আবার বিকর্ষণপূর্ব্বক পৃথিবীকে পরিচালিত করিতেছেন। তাঁহার এই বিচিত্র রহস্য ভেদ করা মানববুদ্ধির অগম্য। সেই এক শক্তিই অবস্থা, আধার ও উপাদান বিশেষে, তাড়িতাকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ,

রাসায়নিক আকর্ষণ, যোগাকর্ষণ, আণুবিক আকর্ষণ ইত্যাদি বিবিধ শক্তিরূপে আমাদের অনুভূত হইতেছেন। ইহাই তাঁহার বিচিত্র মহিমার গূঢ় রহস্য। বেদান্তবাদীরা ইহাকে অনির্ব্বচনীয়া শক্তি বলিয়াছেন। মায়াবাদীরা অঘটন ঘটনপটীয়সী মায়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা সাদাসিধা ভাবে দেখিব, কিরূপে এক শক্তির বলে জগৎ কার্য্য চলিতেছে। কোন জনশূন্য প্রান্তরে যাইয়া যদি কাহাকেও চীৎকারপূর্ব্বক ডাকা যায়, তাহা হইলে তাহার পরক্ষণেই তদনুরূপ আর একটী শব্দ আমাদের অনুভূত হয়। এটী হইতেছে প্রতিঘাত জনিত শব্দ। নিরাকার সাকার সকল বস্তুরই স্বভাব এই যে, তাহার প্রতি কোন একটী ক্রিয়া করিলে তাহার আর একটী প্রতিফলিত ক্রিয়া আপনা আপনি উৎপন্ন হয়। ইহা শক্তির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সকল বস্তুতেই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এই দুই প্রকার শক্তি এক সময়ে ক্রিয়া প্রকাশ করে। কিন্তু ইহা প্রকৃত পক্ষে দুই শক্তির কার্য্য নহে। এক শক্তিরই কার্য্য। উহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ এবং পরম্পরিত ক্রিয়া বহির্দ্দিকে প্রসারণ বা বিক্ষেপণ। এক শক্তির এই দুই প্রকার বিকাশের ফলে অদ্ভুত কৌশলময় জগৎ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। এই কেন্দ্রাভিমুখিনী আকর্ষণী শক্তি ও কেন্দ্রাপসারিণী বিকর্ষণী শক্তিদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্নরূপে জগতের সমুদয় বিষয়ে, সাকারে নিরাকারে প্রত্যেক পরমাণুতে, প্রত্যেক আত্মাতে যুগপৎ কার্য্য করিয়া জগদ্ব্যাপার সমাধা করিতেছে। ইহাই সেই অনন্ত অনির্ব্বচনীয় শক্তিমানের বিচিত্র লীলা। এই শক্তিদ্বয় দেবাসুর সংগ্রামরূপে মানবাত্মায় প্রতিভাত হইতেছে।

একদিকে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমূহ মানবাত্মাকে সংসারাসক্তিদ্বারা বন্ধন করিয়া "প্রেয়ের" দিকে আকর্ষণ করিতেছে। আর একদিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তিসমূহ, আধ্যাত্মিক রাজ্যের মধ্য দিয়া শ্রেয়ের দিকে আকর্ষণ করিয়া দেবত্বে পরিণত করিতেছে। একদিকে দুঃখ, যন্ত্রণা, অমঙ্গল, আর একদিকে সুখ, সৌন্দর্য্য, আনন্দ সম্ভোগ। এই বিরুদ্ধ ভাবের সংঘর্ষে জগতের নানা প্রকার অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া সেই পরম সুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতেছে। জড় জগতেও এই শক্তির বলে অসীম সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতেছে। মানবের স্থূলদেহে যত কিছু গ্রহণ বর্জ্জন ব্যাপার চলিতেছে, তৎসমুদয়ই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্নরূপে প্রকাশমান শক্তিদ্বয়ের যোগে সমাধা হইতেছে। বাহ্য জগতে ব্যাপ্ত এই বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয় যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া পৃথিবীকে এইরূপ সুন্দর, সুশ্রী ও গোলাকার করিয়াছে! ইহাই সেই মহিমাময়ের অনির্ব্বচনীয় মহীয়সী শক্তির মহালীলা। এক্ষণে আইস পাঠক, আমরা একত্র হইয়া আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সেই মহাশক্তিমানের নিকট সকাতরে প্রার্থনা করি।

প্রার্থনা।

হে সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত মহিমাময় মহেশ্বর! আমরা তোমার অনন্তশক্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাদিগকে মনুষ্যত্ব বিকাশের অনুকূল শক্তি সামর্থ্য প্রদান কর। হে প্রভু! তুমি যে সমুদয় কঠিন ও দুঃসাধ্য কর্ম্ম আমাদিগের নিকট উপস্থিত কর, তাহা সাধনের উপযোগী আমাদিগকে সুদৃঢ় শক্তিশালী কর। তোমার কার্য্যানুরোধে

প্রাপ্ত দুঃখ-কষ্ট যাহাতে আমরা অবলীলাক্রমে সহ্য করিতে পারি, আমাদিগকে তদনুযায়ী সহিষ্ণুতা শক্তি প্রদান কর। আমরা শারীরিক মানসিক ক্লেশ ভয়ে কোন সময় যেন কর্ত্তব্য হইতে বিরত না হই, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। হে সকল শক্তির নিয়ন্তা মহাশক্তিমান্! তুমি আমাদিগকে নির্ম্মল বুদ্ধি-শক্তি প্রদান করিয়া মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ কর। হে মহিমার্ণব! তুমি আমাদের দেহে নিরাময়িক শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্তিদান কর। আমরা যেন শারীরিক মানসিক উভয় প্রকারে শক্তিশালী হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করতঃ তোমার অনন্ত মহিমার গৌরব রক্ষা করিতে পারি; আমাদিগকে এই সুযোগ প্রদান কর। আমাদিগের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করতঃ আমাদিগকে আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান্ করিয়া সকল প্রকার ভয় হইতে মুক্ত কর। হে চির নূতন অনন্ত ভাবময় পরম পিতা! তোমার ভাবময় স্বরূপের মধ্য দিয়া তোমার মহীয়সী শক্তির প্রভাব যে কত প্রকারে নূতন নূতন ভাবে বিকশিত করিতেছ, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। তোমার অনন্তশক্তির নিকট তোমার প্রদত্ত মানবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি সামর্থ্য অতি তুচ্ছ, কিন্তু আমরা তাহা অজ্ঞানতার আবরণে অনুভব করিতে পারি না। অতএব হে সর্ব্বশক্তিমান্! আমরা যেন কোন প্রকার শক্তিসামর্থ্যের অহঙ্কার না করি, আমরা তোমার শক্তিতেই শক্তিমান্, ইহা যেন আমাদের দৃঢ়রূপে স্মরণ থাকে; আমাদিগকে এইরূপ বুদ্ধিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি প্রদান কর। এবং আমাদিগকে আবশ্যকানুযায়ী সকল প্রকার শক্তি প্রদান করতঃ তোমার আদেশ পালনের উপযুক্ত করিয়া

লও। আমাদের সমুদয় বিদ্যা-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য তোমার কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া যেন মানবজন্মের সফলতা লাভ করিতে পারি, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। শান্তি, শান্তি, শান্তি।

পরিশিষ্ট

—ঃ*ঃ—

স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা আলেচনা করা হইল, তাহাতে আমার মনে হইতেছে যে, উহার অপূর্ণতা দোষ বহু পরিমাণে রহিয়া গেল। যে সমুদয় তত্ত্বগুলি বিবিধ শাস্ত্র সাগরে বিশৃঙ্খল-ভাবে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, যাহা দেশীয় বিদেশীয় সাধু মহাত্মাগণ চর্ব্বণ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া পাঠক সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি; কিন্তু ইহাতে আমার মনে তৃপ্তিবোধ না হওয়ায়, এ সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করিব।

স্বরূপ অর্থে, কোন বস্তুর রূপ, গুণ, ক্রিয়া, ভাব, লক্ষণাদি। ইহার আরও গভীর অর্থ হইতেছে, সেই বস্তু নিজের কাছে নিজে যাহা, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে যেরূপ ভাবাপন্ন, তাহাই তাহার প্রকৃত স্বরূপ। আর তত্ত্ব শব্দে, তৎ-ত্ব; অর্থাৎ তাহা যে তাহাই, সেই সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানমূলক ব্যাপার বা তল্লাস। এক্ষণে দেখা যাউক, কোন বস্তু বা ব্যক্তি অথবা কোন শক্তি, সে নিজের কাছে নিজে যাহা, তাহা অন্য কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে অনুভূত ও ব্যক্ত হইতে পারে কি না। আমি এক ব্যক্তি; আমি আমাকে যতদূর জানি, অন্য ব্যক্তি তাহা কখনই জানিতে পারে না। যেমন আমাদের দেশের রাজা, তাঁহাকে আমরা কতদূর জানি। আমরা তাঁহার রূপ, গুণ, ভাব,

চরিত্র লইয়া কত আলোচনা করি, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ সর্ব্বতোভাবে পূর্ণরূপে, আমরা কখনই জানিতে পারি না। তাঁহার স্বরূপ পূর্ণরূপে তিনিই জানেন। সূর্য্যকে আমরা একটা প্রকাণ্ড তেজোময় জড়পিণ্ড বলিয়া জানি, এবং তাঁহার গুণ ও কার্য্য-কারিতার বিষয় কত আলোচনা করি, কিন্তু তিনি সচেতন জীব কি অচেতন জড়, তাহা তিনিই জানেন। আমরা তাঁহাকে নশ্বর জড়পিণ্ড বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি; আবার তিনিও আমাদের অতীত, বর্ত্তমান লক্ষ লক্ষ পুরুষের জন্ম-মৃত্যুরূপ জীবনপ্রবাহ স্থির দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও দেখিবেন। সুতরাং তিনি নশ্বর জড় কি, আমরা নশ্বর জীব তাহা কে বলিতে পারে। তিনি নিজের কাছে নিজে যাহা, তাহা সম্পূর্ণরূপে তিনিই জানেন, আমরা তাহা সর্ব্বতোভাবে নিঃসন্দেহ-রূপে কখনই জানিতে পারি না। ঈশ্বর সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা। তিনি অনাদি অনন্ত, তাঁহার স্বরূপও অনাদি অনন্ত। সুতরাং তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ পূর্ণরূপে অনুভূত ও ব্যক্ত হওয়া মানবের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না। তাঁহাকে পূর্ণরূপে তিনিই জানেন।

ইহার মধ্যে আরও একটী দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার আছে, তাহা এই যে, সূক্ষ্ম মানসগত ভাবমূলক বিষয় যাহা, যথা, বিশুদ্ধ জ্ঞানমূলক সরলতা, বিশুদ্ধ প্রেম ও পবিত্রতা ইত্যাদির যে ভাব, তাহা জানিলেও ভাষা দ্বারা লেখনীতে ব্যক্ত করা যায় না। এই জন্যই অতীতকালের সাধু মহাত্মাগণ তাঁহার স্বরূপ যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা সম্যক্‌রূপে ভাষা দ্বারা লেখনীতে ব্যক্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। মহাত্মা বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষ তলে মৃত্যুশয্যায় শায়িত আছেন, এমন সময় তাঁহার এক শিষ্য

জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুদেব! মানুষের পুনর্জ্জন্ম কি আছে? তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমি কি কখন তোমাদিগকে বলিয়াছি যে পুনর্জ্জন্ম নাই"। এই বলিয়া তিনি শিষ্যকে একটী গাছ হইতে কতকগুলি পাতা আনিতে বলিলেন। শিষ্য পাতা আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পাতা তোমার হাতে বেশী, না গাছে বেশী; তাহাতে শিষ্য বলিলেন, হাত অপেক্ষা গাছে অনেক বেশী। তৎপরে বুদ্ধদেব বলিলেন, আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি তাহা ঐ হাতে, আর যাহা বলিতে পারি নাই, তাহা ঐ গাছে রহিল। ইহা শুনিয়া শিষ্যটী অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

একটী বিবাহিতা বালিকাকে, তাঁহার সঙ্গিনী একটী অবিবাহিতা বালিকা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দিদি, তোর স্বামী এলে তোর মনে কিরূপ আনন্দ হয় বল্ দেখি?" তাহাতে বিবাহিতা উত্তর করিলেন, "আমি তোকে তাহা কি করিয়া বুঝাইব, তোর স্বামী এলে তুই জানিতে পারিবি"। ইহা তুচ্ছ কথা হইলেও বিবাহিতার উত্তরে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বিশুদ্ধ সরলতাপূর্ণ প্রেমানন্দের ভাব যাহা, তাহা ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। যিনি সেই পরম প্রেমময়ের প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া তাঁহাকে একমাত্র জীবন স্বামীরূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন, তিনিই জানেন প্রেমানন্দ কি প্রকার সুখদায়ক। একব্যক্তি জন্মাবধি কখনও ঘৃত পান করে নাই, সে অন্য একজনকে ঘৃত পান করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মহাশয়! ঘি কেমন খেলেন? তিনি উত্তর করিলেন, "খেলাম যেমন ঘি; কথা দ্বারা আমি তোমাকে কি করিয়া বুঝাইব, খাইয়া দেখিলে জানিতে

পারিবে"। এইরূপ ঈশ্বরের প্রেমরস আস্বাদন করিতে না পারিলে জানা যায় না যে তিনি কি মধুর। স্বরূপরাজ্যে প্রবেশ করিবার এই সমুদয় বাধা-বিঘ্ন থাকা হেতু অতি কঠিন হইলেও, নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা মানবের পক্ষে কখনই কর্ত্তব্য নহে। চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব লাভ করা কঠিন বলিয়াই তিনি আমাদের অনন্তকালের সাধনীয় ধন হইয়াছেন। কেবলমাত্র আহার বিহারাদি সুখ-সম্ভোগরূপ পশুবৃত্তি চরিতার্থ করা মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে। শূকর, শূকরী, ময়ূর, ময়ূরী, রাজা ও রাণী সকলেই এক প্রকার ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ করে। কীটে ব্রণাস্বাদন করে, শকুনি শবাস্বাদন করে, কৃমি বিষ্ঠাস্বাদন করে এবং মনুষ্যেরা ক্ষীর-সর-নবনী ও বিবিধ উৎকৃষ্ট মধুর রস আস্বাদন করে; কিন্তু রসনার পরিতৃপ্তিরূপ সুখসম্ভোগ সকলেরই এক প্রকার হইয়া থাকে। ইহার কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই। সুতরাং কেবল-মাত্র ইন্দ্রিয় সুখে তৃপ্ত থাকা নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য্য। জ্ঞানের চক্ষে ঐ সমুদয় সুখ অতি তুচ্ছ শারীরিক উত্তেজনা মাত্র। স্বাধীন বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া যদি তাঁহার মধুর প্রেমরসাস্বাদন করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে এ জন্ম যে বৃথা নষ্ট হইল। ইহাপেক্ষা পশু জন্ম হওয়া ভালই ছিল।

অতএব সেই অসীম জ্ঞানসিন্ধু আমাদিগকে বিন্দুমাত্র জ্ঞানকণিকা প্রদান করিয়া আমাদের হৃদয়ে যে জ্ঞানালোক জ্বালিয়া দিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব যতদূর সম্ভব জানিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন; তাহাই অবলম্বন করিয়া

তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। কেবলমাত্র শাস্ত্র পড়িয়া বা লোকের উপদেশ শুনিয়া জ্ঞানী হইলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না, তাঁহাব সান্নিধ্য লাভ করিতে হইলে অর্থাৎ তাঁহার কাছে যাইতে হইলে, আপনার অক্ষমতা ও অজ্ঞতারূপ দৈন্যতা অনুভবপূর্ব্বক তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া ব্যাকুল অন্তরে তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। এই উপাসনা সাধারণতঃ দুই প্রকার। যথা—পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ। পরোক্ষ সাধনের অবলম্বন হইতেছে, বিশ্বাসমূলক ভক্তি ও প্রত্যক্ষ সাধনের অবলম্বন হইতেছে, বিশুদ্ধ জ্ঞানমূলক ভক্তি। ঈশ্বর তাঁহার এই জগৎ ও আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া পালন ও রক্ষা করিতেছেন। আমাদের খাদ্য, পানীয় ও বিশুদ্ধ বায়ু যোগাইতেছেন। আমাদিগকে বিবিধ সুখসম্পদের অধিকারী করিয়াছেন। নানা প্রকার বিপদাপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। পাপীকে শাস্তি দিতেছেন, পুণ্যবান্‌কে পুরস্কৃত করিতেছেন। সুতরাং নিশ্চয়ই তিনি আছেন, এই প্রকার বিশ্বাসমূলক যে ভক্তি, তাহাই পরোক্ষ সাধনের অবলম্বন। এক্ষণে বিশ্বাস অর্থে কি তাহা দেখা যাউক।

বিশ্বাস অর্থে আমাদের বিবেচনা শক্তির একটা আনুমানিক নিশ্চয়াত্মিকা মীমাংসা। কিন্তু এখানে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব দেখা যাইতেছে। আমরা যখন কোন বিষয় জ্ঞানযোগে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে না পারি, তখন আমাদিগকে অনুমানবলে বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং কোন বিষয় নিশ্চিতরূপে জানা ও নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করা এক নহে। উভয়ে অনেক প্রভেদ। কোন কারণে একটু সন্দেহের বাতাস আসিলে ঐ বিশ্বাস টলিয়া যায়। এই সকল

বিশ্বাসমূলক ভক্তি ও ভাবপ্রধান ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে কেহ কেহ অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া যান। আজ যিনি পরম বৈষ্ণব আছেন, কাল হয় ত তিনি ঘোর শাক্ত হইয়া বসিলেন। এবং বিশ্বাসমূলক পরোক্ষ উপাসকদিগের পরস্পর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিবাদ বিসম্বাদ যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও মূল কারণ ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রকৃতরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব। পরন্তু ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে বিশ্বাস হইতে ক্রমান্বয়ে জ্ঞানের পথে উঠিতে হইবে। ইহাতে বলা হইতেছে না যে, বিশ্বাসমূলক পরোক্ষ উপাসনা দ্বারা ঈশ্বর লাভ হয় না। হইতে পারে, হইতেছে ও হইবে। কিন্তু ইহা সাধনের উচ্চ আদর্শ নহে। প্রত্যক্ষ উপাসনাই সাধনের উন্নত আদর্শ। এক্ষণে প্রত্যক্ষ উপাসনা কাহাকে বলে, তাহা বলিবার পূর্ব্বে একটী গল্প করিতে হইল।

এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কন কালে ইহার ভ্রম ও অপূর্ণতাদোষ নিবারণ জন্য আমি কোন এক অশীতিপর বৃদ্ধ প্রতিভাশালী পণ্ডিতকে ইহার কয়েক ফর্ম্মা দেখিতে অনুরোধ করায় তিনি গ্রন্থখানির নাম শুনিয়াই একটু অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, স্বরূপতত্ত্ব আবার কি একটা, উহা পড়িয়া কি হইবে। বিশ্বাস কর, বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর। গীতা পাঠ কর। যাহা ভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন।

তাহাতে আমি বলিলাম, মহাশয়, গীতাখানি প্রাচীন কোন দার্শনিক পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রশ্নোত্তরচ্ছলে রচিত। ইহাতে তিনি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। তথাপি তাঁহার অনিচ্ছাস্বত্ত্বে, স্বরূপ-তত্ত্বের কয়েক পৃষ্ঠা পড়াইয়া শুনাইলে তিনি বলিলেন, রচনা ভাল

হইয়াছে। যাহা হউক, তাঁহার ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, তিনি দর্শন শাস্ত্রটা একটা জঞ্জাল স্বরূপ মনে করেন এবং পরমার্থ তত্ত্ব লাভের জন্য একেবারেই মাথা খাটাইতে চাহেন না। পুনরায় তিনি মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে কয়েকটী মায়াবাদের শ্লোক আবৃত্তি করিয়া, আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, এই মায়াময় সংসারে কিছুই জানিবার বুঝিবার উপায় নাই। শাস্ত্র মতানুযায়ী বিশ্বাসের দ্বারা উপাসনা করাই ভাল। আমি তাহাতে বলিলাম, আধুনিক সভ্যজগতে বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়া প্রাচীন মায়াবাদ কাল্পনিক ভূত-প্রেতবাদের ন্যায় এদেশ হইতে চিরনির্ব্বাসিত হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত আমরা উভয়ে নিরস্ত হইলাম। যাহা হউক, সংসারের অধিকাংশ লোক এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, সংসারের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ধর্ম্মালোচনার সময় পান না। অথবা পাইলেও তাহা আলোচনা করা আবশ্যক মনে করেন না। সময় কাটাইবার জন্য হয় ত তাস খেলিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ, তাঁহাদের ঈশ্বরলাভের অতি সহজসাধ্য উপায় রহিয়াছে "বিশ্বাস"। তাঁহাদের জীবনের প্রবাহ যেন একেবারে জমিয়া গিয়াছে। তাই চির অভ্যস্ত সাম্প্রদায়িক ভাবের ক্রিয়া কলাপ ও উপাসনাদি লইয়া অন্ধভাবে জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু উন্নতিশীল ও বুদ্ধি বিবেচনাসম্পন্ন মানব প্রকৃতিকে চাপা দিয়া অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া জীবলীলা সম্পন্ন করা নিতান্ত আলস্যপরায়ণ মূর্খের কার্য্য। এক্ষণে প্রত্যক্ষ উপাসনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথমাংশে কিছু বলা হইয়াছে, তজ্জন্য যদি পুনরুক্তি দোষ হয়, পাঠক তাহা গ্রহণ করিবেন না। এই প্রত্যক্ষ উপাসনার প্রধান অবলম্বন হইতেছে,

আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব। ইহাই দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি। তিনি কি প্রকার, তাঁহার কি গুণ, তিনি কি ভাবে লীলা করিতেছেন, আমি কি ও কে, কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, আমাকে কি করিতে হইবে, তিনি আমাতে তাঁহার জ্ঞানকণিকা প্রদান করিয়া কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, এই সমুদয় বিষয় সাধু মহাত্মাদিগের দ্বারা মানবীয় জ্ঞান বিজ্ঞান কর্তৃক যতদূর যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই অবলম্বনপূর্ব্বক চিন্তা ও বিচার দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের অন্তর্য্যামীরূপে, চক্ষুর উপরে, চক্ষুর চক্ষুরূপে, এইরূপে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দ্বারে, তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং আত্মজ্ঞান লাভপূর্ব্বক আপনার মনকে সরল, নির্ম্মল ও পবিত্র করিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে অন্তরে বাহিরে তিনি উপলব্ধি হইবেন। বাহিরে তাঁহার মঙ্গল হস্তের সুকোমল স্পর্শ প্রত্যেক বিষয়ে অনুভব করা যাইবে এবং অন্তরে তাঁহার অভয়প্রদ আশার বাণী শুনিতে পাওয়া যাইবে। নির্ম্মল ভক্তিযোগে সেই স্পর্শমণিকে স্পর্শ করিতে পারিলে, সাধকের দেহ মন চিরপবিত্রতা লাভ করিবে। তখন সংসার ও ধর্ম্ম একত্র মিশিয়া এক হইয়া যাইবে। কাম ক্রোধাদি দুর্দ্দান্ত রিপুগণ বন্ধুর ন্যায় সেবা করিতে থাকিবে। ইহাই প্রত্যক্ষ উপাসকের উচ্চতম আদর্শ।

কিন্তু এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে একান্ত মনে তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। কেবল তাঁহাকে জানিলে বা চিনিলে হইবে না। এই উপাসনার কোন সাম্প্রদায়িক বিশিষ্টতার কথা আমি বলিতেছি না। কারণ, আমি কোন ধর্ম্মযাজকও নহি

অথবা কোন সম্প্রদায়ের আচার্য্য বা গুরুও নহি। আমি দীন হীন অজ্ঞান সাধারণের কৃপার পাত্র ও সেবক। সুতরাং যিনি যে ধর্ম্মেই থাকুন, তদনুযায়ী প্রণালী অনুসারে আপনার দৈন্যতা অনুভবপূর্ব্বক ব্যাকুলভাবে তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। এই উপাসনা প্রণালী সম্প্রদায় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের প্রধান অবলম্বন হইতেছে নাম সাধন। ইহা বাক্‌শক্তি দ্বারা সাধন। এই নাম সাধনের গুণও অশেষ প্রকারে বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আমি এই গ্রন্থের স্থানান্তরে বলিয়াছি, ঈশ্বর নামরূপ উপাধিশূন্য। একথাও মিথ্যা নহে। কিন্তু তিনি উপাধিশূন্য হইলেও বাক্য দ্বারা সাধনের জন্য তাঁহার কল্পিত নামসূত্র অবলম্বন করিতে হইবে। যেমন একটী সীমা বিশিষ্ট সরল রেখা অঙ্কিত করিতে গেলে অগ্রে দুইটী বিন্দু কল্পনা করিয়া লইতে হয়। কিন্তু অংশ ও পরিমাণ শূন্য হেতু বিন্দু অঙ্কিত করা যায় না, তথাপি দুইটী ক্ষুদ্র চিহ্ন দিয়া লইতে হয়। সেইরূপ সেই উপাধিশূন্য পরমাত্মাকে চিত্তে ধারণা রাখিবার জন্য বাক্যরূপ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া লইতে হয়। নাম করিলেই নামীর কথা স্মরণ হয়। যেমন তেঁতুল বলিলে উহার অম্লত্ব গুণ স্মরণ হইয়া মুখে জল আইসে, সেইরূপ তাঁহার নাম করিলে তাঁহার স্বরূপ স্মরণ হইয়া হৃদয় প্রেমানন্দরসে অভিষিক্ত হয়, গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। চক্ষে অশ্রুধারা নির্গত হয়। তখন আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনাদি বিবিধ উপকরণ দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া উপাসক কৃতার্থ হন।

এইরূপে ব্যাকুল ভাবে একান্তমনে তাঁহার উপাসনা করিতে করিতে অন্তরে তাঁহার বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। সেই বাণীটী

হইতেছে, "আমি এই, আমি ওই, আমি এই।" এবং প্রত্যাদেশ হইতে থাকে, "এই যে আমি, তোমাতে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি, তুমি প্রস্তুত হইয়া আমার কাছে আইস।" পাঠক ইহাতে হাস্য করিবেন না; ইহা অতিশয় সত্য কথা। কিন্তু কি পরিমাণ উপাসনা দ্বারা কতদিনে এই অবস্থা লাভ হইতে পারে, তাহা বলা যায় না। তবে ইহা লাভ করিতে হইলে ডাকার মত ডাকা চাই, নতুবা হইবে না। ইহাই প্রত্যক্ষ উপাসনার সাধন সঙ্কেত ও শেষ পরিণতি। এই অবস্থায় উপাসকের অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ এক হইয়া ভেদাভেদ জ্ঞান তিরোহিত হয়। যেমন উন্নত পর্ব্বত শিখরে আরোহণপূর্ব্বক নিম্ন দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সমুদয়ই একাকার ও সমতল ভাব দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ উন্নত জ্ঞানের স্তরে আরোহণ করিয়া সাধক উচ্চ নীচ, সাধু পাপী ইত্যাদি সকলকেই সমানভাবে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। তখন কেবল উপাসকের আমিত্ব রূপ ব্যক্তিত্বটী সূক্ষ্ম অহঙ্কাররূপে পরমাত্মায় লিপ্ত হইয়া অবস্থান করে। কিন্তু এই অহঙ্কারটুকু একেবারে দূর হয় না এবং হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ, দেহীর যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ তাহার দেহিত্বরূপ আমিত্ব বোধ থাকিবেই। এই ভেদ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। অদ্বৈতবাদী প্রাচীন ঋষিরা এই আমিত্বটাকে সাধনবলে জীবিতাবস্থায় পরমাত্মায় লয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে মানব সেই পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া আপনার আমিত্বকে পরমাত্মার সহিত মিশাইয়া "আমিই সেই পরমাত্মা" এই জ্ঞান বা অবস্থা লাভ করেন। তখন আর তাঁহার ব্যক্তিগত পৃথক সত্তা থাকে না। কিন্তু এরূপ অবস্থা লাভ ধ্যানকালে

সাময়িকভাবে সম্ভব হইলেও সাধারণ ভাবে কর্ম্মগত অবস্থায় সাধকের জীবনব্যাপী হইতে পারে না। পরমাত্মা অসীম, মহান্, মানবাত্মা সসীম, ক্ষুদ্র; তাহাকে জীবাত্মার স্তর ত্যাগ করিয়া একেবারে পরমাত্মা হইয়া যাওয়া কিরূপে সম্ভব হয়। এ মতাবলম্বিগণ নির্ব্বাণমুক্তির পক্ষপাতী। ইঁহারা পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখ ভোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া পরমাত্মায় লীন হইয়া বিশ্রাম সুখ লাভ করিবার প্রয়াসী। তাঁহারা চিনি খাইতে চাহেন না, নিজেরাই চিনি হইতে চাহেন। যাহা হউক, এরূপ অদ্বৈতবাদ আত্মসুখপ্রিয় মানবের একটী কল্পিত ধারণা মাত্র। এক্ষণে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মায় ভেদাভেদবাদের সামঞ্জস্য কিসে রক্ষা হয়, সে সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

মনে কর আমি একটী জীবাত্মা: আমার দেহ, মন, অহঙ্কার বা আমিত্ব, অন্যান্য অচেতন, সচেতন বস্তু, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও সর্ব্বব্যাপী বিবিধ শক্তিপুঞ্জ, এই সমুদয় লইয়া একত্রে যাহা হয়, তাহাকে আমরা জগৎ বলি। সুতরাং আমিরূপ জীবাত্মাও ঐ জগৎ হইতে পৃথক নহি, উহারই অন্তর্গত। অর্থাৎ প্রকাশময় সমষ্টিগত জগতের আমি ব্যষ্টিগত অংশস্বরূপ। এবং এই জগৎরূপ যন্ত্রের যিনি যন্ত্রী, তাঁহার কাছে আমিরূপ জীবাত্মা জগতের অংশরূপে তাঁহার লীলার সহযোগী অর্থাৎ এই জগৎ যন্ত্রের কার্য্য পরিচালন জন্য আমার একটা পৃথক দায়িত্ব আছে। এই অর্থে আমি তাঁহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। ভিন্ন না হইয়া তাঁহার সহিত এক হইয়া গেলে, আমার দেহীরূপে কর্ত্তব্য যাহা, তাহা কিরূপে সম্পন্ন করি। তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া গেলে

আমি বা কোথায় রহিলাম, আমার কর্ম্মস্থলই বা কোথায় রহিল। অথচ জীবিতাবস্থায় ক্ষণমাত্রও কর্ম্ম না করিয়া স্থির থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মায় এই যে আপেক্ষিক ভেদ, ইহা অতিশয় সত্য ও অনিবার্য্য। এই ভেদ দূর করিবার কোন উপায়ও নাই, আবশ্যকও নাই। কারণ, এই ভেদ অভেদের কোন বাধা জন্মাইতেছে না বরং তাহার প্রমাণ করিতেছে। সুতরাং মানবাত্মার ব্যক্তিগত সূক্ষ্ম অহঙ্কারকে তাঁহার সেবক-রূপে তাঁহার আজ্ঞাধীন কর্ম্মচারীরূপে রাখিতে হইবে। এক্ষণে জীবাত্মায় পরমাত্মায় অভেদ কিরূপে তাহা দেখান যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই জীবন্ত জগৎরূপ যন্ত্রের তিনি মহাযন্ত্রী। এস্থলে যন্ত্র হইতে যন্ত্রী পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু এ যন্ত্রী সেরূপ নহে। যিনিই যন্ত্র তিনিই যন্ত্রী। যিনিই ঈশ্বর তাঁহার নিজের স্বরূপ হইতেই তিনি এই জগৎ প্রকাশিত করিয়াছেন। সুতরাং এই জগৎরূপীই তিনি। তিনি ভিন্ন এই জগতে কোন বস্তু, কোন শক্তি বা কোন পৃথক সত্বা নাই। সুতরাং তাঁহার এই সমষ্টিগত ভাবমূলক প্রকাশময় জগৎ হইতে আমিরূপ জীবাত্মাকে পৃথক করা যায় না। এই অর্থে জীবাত্মা পরমাত্মায় সম্পূর্ণরূপ অভেদ। এই সমুদয় আলো-চনা ও বিচার দ্বারা নির্ণীত হইল যে, জীবাত্মা পরমাত্মার সমষ্টিগত ভাবের দিক হইতে তাঁহার সহিত অভেদ। এবং ব্যষ্টিগত ভাবের দিক হইতে তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ প্রভেদ। সুতরাং এই ভেদে অভেদেরই প্রমাণ করিতেছে। ইহা না থাকিলে অভেদ শব্দটার অর্থ করা যাইত না বা কথাটাও থাকিত না। কারণ অভেদ কথাটা প্রয়োগ করিতে গেলেই দুইটী বস্তুর

কথা মনে পড়ে। একটী বস্তু নিজে নিজে অভেদ ইহা অসঙ্গত। সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মায় এই ভেদ ও অভেদ, ইহা একটী বস্তুর দুইটী ভাবময় স্বরূপ মাত্র। যেমন একখানি কাগজের দুইটী পিঠ, কিন্তু উহা পরস্পর পৃথক করা যায় না। এই আপেক্ষিক ভেদই জীবাত্মা পরমাত্মায় পরস্পর প্রেম ভক্তি বিনিময় করিয়া দিতেছে এবং ইহা দ্বারাই তিনি তাঁহার বিচিত্র মানবলীলা সম্পন্ন করিতেছেন। হে পরম প্রেমময় পরমেশ্বর! ধন্য তোমার লীলা, ধন্য তোমার বিচিত্র কৌশল। তুমি আমাদিগকে জ্ঞানালোক প্রদান করিয়া আমাদের ব্যক্তিগত অহঙ্কারকে সর্ব্বতো ভাবে তোমার অধীন করিয়া লও। ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। শান্তি, শান্তি, শান্তি।

সুখের সংসার।

পাঠক! আমরা স্বরূপতত্ত্ব আলোচনা করিয়া হৃদয়ে নূতন আশার আলোক লাভ করিলাম। বদ্ধমূল কুসংস্কারাপন্ন প্রবাহ-হীন দুর্ব্বলচিত্তের চিরপোষিত ভ্রমপূর্ণ ধারণা দূর হইয়া অন্তঃকরণ কিয়ৎ পরিমাণে সবল হইল। বিশেষরূপে বুঝিতে পারা গেল, ঈশ্বর মানবের ন্যায় ক্ষুদ্র, সসীম, সাকার, পরিমিত বস্তু নহেন। তিনি অতি বৃহৎ, অতি মহান্, অসীম অনন্ত। তাঁহার প্রকাশময় স্বরূপ, নানাত্ব, বহুত্বরূপে সগুণ, সাকার, পরিমিত হইলেও তিনি নির্গুণ, নিরাকার, অনন্ত, অখণ্ড, অদ্বিতীয়, এক। তাঁহার এই প্রকাশময় স্বরূপের মধ্য দিয়া সমুদয় বিশ্বব্রাহ্মণ্ডকে এক সূত্রে প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়া নিত্য নূতনরূপে তাঁহার অনন্ত মহিমা ব্যক্ত করিতেছেন। এই বিশ্বে অসীম আনন্দরাশি বিতরণ-

পূর্ব্বক আমাদিগকে অবিশ্রান্ত ভালবাসিয়া সুখী করিতেছেন। তিনি চিরজাগ্রত জ্ঞানময়রূপে এই মোহনিদ্রায় নিদ্রিত অজ্ঞানময় জগৎকে সুন্দররূপে, সুকৌশলে ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত করিয়া তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া লইতেছেন। এই অসামান্য শিল্প-নৈপুণ্যপূর্ণ সুশৃঙ্খলাময় জগৎরূপ যন্ত্রের তিনিই মহাযন্ত্রী এবং জীবন্ত জগতের প্রাণস্বরূপ। তাঁহার শক্তি অনন্তা ও অনির্ব্বচনীয়া। মানবের ক্ষুদ্র বিজ্ঞান ঐ শক্তির লক্ষাংশের একাংশও অদ্যাপি আয়ত্তাধীন করিতে পারে নাই। তিনি পরম পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক, নির্ব্বিকার, নিত্যানন্দময়রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকিয়া আমাদিগকে নানাবিধ সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদের মধ্য দিয়া বিশুদ্ধ করিয়া মঙ্গলের পথে লইয়া যাইতেছেন। এই সমুদয় তত্ত্ব আলোচনা ও বিচার দ্বারা আমরা তাঁহার নিকট এই আদেশ ও উপদেশ পাইতেছি যে, একমাত্র তাঁহা হইতেই তাঁহার প্রকাশ স্বরূপের মধ্য দিয়া আমরা এই বিশ্বসংসারে আসিয়াছি এবং তাঁহার কার্য্যেই এই স্বল্পস্থায়ী জীবন উৎসর্গ করিয়া তাঁহাতেই যাইতে হইবে। অর্থাৎ এই সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মসংগ্রাম দ্বারা এই কর্ম্মময় জীবন তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার কার্য্যে উৎসর্গ করিয়া সেই অনন্তধামে ফিরিতে হইবে। অতএব এই সংসারকে "সম্যকরূপে সার" এই অর্থে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারে থাকিয়াই, প্রার্থনা, চেষ্টা ও সাধন দ্বারা ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া, সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন আপদ বিপদকে তুচ্ছ করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে পরম সুখে জীবনযাপনপূর্ব্বক, সেই মহিমাময়ের শান্তি নিকেতনে উপস্থিত হইতে হইবে। কি কৌশলে, কোন ভাবে, কিরূপ ব্যবহার দ্বারা এই দুঃখময় সংসারকে সুখের সংসারে পরিণত করা যাইতে পারে,

তাহা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে যতদূর ব্যক্ত হওয়া সম্ভব, সে বিষয় "সংসার ধর্ম্ম" নামক পুস্তকে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইবে, এক্ষণে স্থূলভাবে, সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলিব।

হে সংসার যন্ত্রণায় প্রপীড়িত অস্থিরচিত্ত পাঠক! যদি সময়াভাবে জ্ঞানালোচনায় অশক্ত হও, তবে এই বিশ্বরূপ অনন্ত শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তোমার অন্ধকারময় হৃদয়ে জ্ঞানের আলোকটী দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; কে ইহা জ্বালিয়া দিলেন, অবশ্য ইহার ভাল উত্তর দিতে পার না। এক্ষণে তুলনা দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

কলিকাতা নগরীর প্রায় প্রত্যেক ঘরগুলিতে দেখিয়াছ, ইলেক্‌ট্রিক কনেকসন্ ফিট করা রহিয়াছে। সমুদয় ঘরের তারগুলি একসূত্রে গ্রথিত ও সংযুক্ত হইয়া উহার কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ কার্য্যালয়ে যাইয়া মিলিত হইয়াছে। সেইখান হইতে ভৌতিক তড়িৎ সূত্রযোগে প্রবাহিত হইয়া সকল গৃহস্থিত তারগুলি তড়িৎপূর্ণ করিয়া রাখে। গৃহস্বামী আবশ্যক মতে যখন তখন বোতাম টিপিলেই তড়িৎপ্রবাহ বিকীর্ণ হইয়া গৃহ আলোকিত হয়। সেইরূপ আমাদের মানব দেহ, তাহার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আদর্শে তাঁহার প্রেমলীলার আধাররূপে, প্রত্যেক মানবাত্মার বাসগৃহরূপে নির্ম্মিত। পরমাত্মারূপ মূল কেন্দ্র হইতে আধ্যাত্মিক তড়িৎ প্রবাহিত হইয়া সকল আত্মার বাসগৃহরূপ দেহগুলি পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের ব্যক্তিগত আমিত্ব শ্রান্ত হইয়া যখন স্থূলদেহের সহিত নিদ্রিত হয়, তখন আত্মা বোতাম টিপিয়া দিয়া উক্ত আধ্যাত্মিক তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করিয়া দেন। আবার যখন দেহসহ আমিত্বটী শ্রান্তি দূর করিয়া কার্য্যক্ষম হয়, তখন

আত্মা পুনরায় বোতাম টিপিয়া দিয়া আধ্যাত্মিক তড়িৎ বিকীর্ণ করতঃ জীবদেহে চৈতন্যের আলোক জ্বালিয়া দেন। ঐ তড়িৎ প্রবাহ যোগেই মানবাত্মায় পরমাত্মার স্বরূপগত গুণসমূহ যথা, জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ, পবিত্রতা, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, সরলতা, সত্য-নিষ্ঠা, ক্ষমা ইত্যাদি নিয়তই প্রতিবিম্বিত হইতেছে। সেই জন্যই শিক্ষা না পাইলেও এ সমুদয় গুণ মানবাত্মায় স্বতঃই ফুটিয়া উঠে। কিন্তু বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে স্থূলদেহের কর্ত্তা মানবের ব্যক্তিগত আমিত্বটী ইন্দ্রিয়গত ব্যাপারে প্রলুব্ধ হইয়া এত মলিন হইয়া পড়ে যে, তখন আত্মাতে প্রতিবিম্বিত উপরোক্ত গুণসমূহ আচ্ছাদিত হইয়া যায়। সেই জন্যই আত্মার মলিনতা দূর করিবাব জন্য অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ ও নিত্য নৈমিত্তিক উপাসনার আবশ্যক হয়।

উপরিউক্ত আধ্যাত্মিক তড়িতের প্রকৃত স্বরূপ মুখে বর্ণনা করা যায় না, কারণ উহা সম্পূর্ণ মানসগত ভাবমূলক ব্যাপার। উহা ভৌতিক তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় চক্ষে দেখা যায় না। সূক্ষ্ম জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রকারেরা ইহাকে পরম-চৈতন্য, পরমাত্মজ্যোতি, চিন্ময়ীশক্তি ইত্যাদি বিবিধ আখ্যা দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সমুদয় সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব আলোচনায় যদি মনস্থির করিতে অক্ষম হও, তবে প্রাতঃকালে একবার পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত কর। কোন্ মহাপুরুষ ঐ সূর্য্যখানা প্রতিদিন ঠিক নিয়মিতরূপে আমাদের সম্মুখে ধরিয়া পৃথিবীকে আলোকময় করিয়া দিতেছেন। ইহার একজন পরিচালক ও নিয়ামক অবশ্যই আছেন, ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর। ইহাই হইতেছে, তটস্থ লক্ষণে ঈশ্বরাস্তিত্বের অনুমানপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। এইরূপ ইহার আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। এই বিশ্বাসই সাধারণ

সংসারী মানবের ভব পারাবারের একমাত্র কর্ণধার। এই বিশ্বাসের বলেই তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া ভক্তিযোগে তাহাতে আঘাতপূর্ব্বক তাঁহার অনন্ত জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করা যায়। তাই কোন সাধু তাঁহার শিষ্যকে বলিয়াছিলেন—তোমার যদি এক সর্ষপ প্রমাণ জীবন্ত বিশ্বাস হইয়া থাকে, তাহা হইলে একান্তমনে যদি পর্ব্বতকে সরিয়া যাইতে বল, সে নিশ্চয়ই সরিয়া যাইবে। এই বিশ্বাস, অনুমান ও কল্পনাযোগে উৎপন্ন হইয়া ভক্তিযোগে দৃঢ় হয়। তখন ইহা দ্বারা অসাধ্য সাধন হইয়া থাকে। সেইজন্য কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন—মানবের ইচ্ছাশক্তির শেষ পরিণতি যে কোথায়, তাহা সে নিজে কল্পনায়ও আনিতে পারে না। অতএব সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে জর্জ্জরিত অস্থিরচিত্ত মানবের পক্ষে তাঁহার প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। এই বিশ্বাসের সহধর্ম্মিণী হইতেছে আশা। বিশ্বাস আসিলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশ্বস্ত বস্তু পাইবার আশা আসিয়া উপস্থিত হয়; এইজন্য আশা বিশ্বাসের চিরসঙ্গিনী। পরে বিশ্বাসের সহযোগে আশার গর্ভে আলোক, আনন্দ ও শান্তি এই তিনটী সূক্ষ্মরূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ফুটিয়া উঠিতে থাকে। তখন ঐ আলোকের সাহায্যেই তাঁহার জ্ঞানালোকপূর্ণ, আনন্দময় শান্তি-নিকেতনে উপস্থিত হওয়া যায়। তখন সংসারীর দুঃখের সংসার "সুখের সংসারে" পরিণত হয়। এক্ষণে মানবের সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

এই পুস্তকের অনেক স্থলে বলা হইয়াছে, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ ও চির জাগ্রত। তিনি আমাদের যত নিকটে আছেন, এত নিকটে আর কিছুই থাকিতে পারে না। বাহ্যজগতের

নিকট আমরা কত বিষয় গোপন করিয়া চতুরতা প্রকাশ করি বটে, কিন্তু তাঁহাকে গোপন করিয়া আমাদের কোন বাক্য, কার্য্য, চিন্তা সম্ভব হইতে পারে না। এই সত্য অনুক্ষণ স্মরণ রাখিয়া প্রলোভনের বস্তু সম্মুখে থাকা সত্বেও পাপ হইতে বিরত থাকিতে হইবে। আপনার স্বাধীনতারূপ অমূল্য রত্নকে হারাইয়া যেন আসক্তি ও ইন্দ্রিয়ের দাস হইতে না হয়, তজ্জন্য সতত সাবধান থাকিতে হইবে। অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আক্রমণকারী শত্রুর সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করা আত্মরক্ষা নহে, উহাকে দেহরক্ষা বলা যায় বটে। প্রকৃত আত্মরক্ষা করিতে হইলে বিবেকাস্ত্র ধারণপূর্ব্বক পাপাসক্তি ও নীচ প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিতে হইবে। পরদ্রব্য ও পরস্ত্রীতে কখন লোভ করিবে না। উহা স্বয়ং উপস্থিত হইলেও ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিবে। মানবের সর্ব্বনাশের যত পথ আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত পথ হইতেছে ব্যভিচার। ধনে, মানে, প্রাণে ও বংশে বিনষ্ট হইবার এমন সুযোগ আর নাই। অতএব এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। আপনার দোষ ত্রুটী স্মরণ করিয়া অপরের সামান্য দোষ ত্রুটী গ্রহণ করিবে না। অপরাধী ব্যক্তি মাত্রেই ঈশ্বরের কৃপার পাত্র ও অজ্ঞান অধম জীব, ইহা বিবেচনা করিয়া কাহারও অপরাধের প্রতিশোধ লইতে যাইয়া নিজে অপরাধী হইবে না। আত্মরক্ষার অধিকার ব্যতীত কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে না। সামান্য কারণে কাহারও সহিত বিবাদ কলহ ও শত্রুতা করিবে না। যাহাকে শত্রু ভাবিয়া বিদ্বেষ প্রকাশপূর্ব্বক ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছ, মনে জানিও সে ব্যক্তিও ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, বৃথালাপ, অসৎপ্রসঙ্গ, হিংসা, দ্বেষ,

পরশ্রীকাতরতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। সকল ধর্ম্মের সারতত্ত্ব ও চরম লক্ষ্য এক অখণ্ড, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, ইহা মনে রাখিয়া সকল ধর্ম্ম ও সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিবে। সকল মনুষ্যের প্রতি প্রীতি সহযোগে ভ্রাতৃভাবে অবস্থা-বিশেষে পিতৃ-মাতৃ ও পুত্র কন্যা ভাবে ব্যবহার করিবে। কুৎসিত বিষয় চিন্তা ও শ্রবণ, কুৎসিত আলাপ ব্যবহার ও কুলোকের সঙ্গ ত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা সত্যের অনুসন্ধানে রত থাকিয়া, সকল ধর্ম্ম, সকল শাস্ত্র, সকল মনুষ্য ও সকল স্থল হইতে সত্য গ্রহণ করিবে। অসত্যের প্রতি সম্মান ও আদর প্রদর্শন করিবে না। যদি কোন সময় আপনার দুর্ব্বলতা ও সামর্থ্যহীনতা হেতু ভ্রম, কুসংস্কার বা দুর্নীতির অনুমোদনপূর্ব্বক অধর্ম্ম ও অসত্যের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে হয়, তাহা হইলে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, ভবিষ্যতে ধর্ম্মের নিকট অধর্ম্ম ও সত্যের নিকট অসত্য নিশ্চয়ই পরাস্ত হইবে এবং যে কোন সময় সুযোগ উপস্থিত হইলে অসত্য, কুসংস্কার ও দুর্নীতিকে পদদলিত করিবে। দীন, দুঃখী, বিপন্ন, দুর্ব্বল, অসহায়, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোককে দয়া ও সাহায্য করিবে। সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় সংযম ও কুপ্রবৃত্তি দমনপূর্ব্বক ধৈর্য্যধারণ করিতে অভ্যাস করিবে। সর্ব্বপ্রকার মাদক সেবন পরিত্যাগ করিবে। মানবের স্বল্প পরিমাণ ক্ষুদ্র জ্ঞানকে মাদকে মত্ত হইয়া আরও ক্ষুদ্র করিবে না। সর্ব্বদা স্বাস্থ্যলাভে যত্নবান থাকিবে। ধর্ম্মের অবিরোধী ন্যায়ার্জ্জিত ধনলাভের চেষ্টা করিবে। অপরিমিত ব্যয়শীল বা অতিশয় কৃপণ হইবে না। রাজা, রাজপ্রতিনিধি, রাজকর্ম্মচারী ও গুরুজনদিগের প্রতি সতত ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিবে এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে সাধ্যানুসারে সাহায্য

করিবে। ধর্ম্মরক্ষার জন্য সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট সন্তুষ্টচিত্তে সহ্য করিবে। আপনার স্বভাব চরিত্রের ও অন্তর বাহিরের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবে। ক্রোধে বা শোকে আপনার ধৈর্য্য নষ্ট করিবে না। উপস্থিত বিষয় মাত্রেই ঈশ্বরানুমোদিত জানিয়া তৎপ্রতি ধীরচিত্তে সতর্কতার সহিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবে। কু-আশা পরিত্যাগ করিয়া আপনার দেহ, মন ও স্বভাবের পবিত্রতা রক্ষা করিবে। সুখকে চেষ্টা করিয়া লইতে যাইবে না, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখরাশি আসিয়া উপস্থিত হইবে। সেই আনন্দময়ের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে করিতে সুখ সম্পদ অযাচিত ভাবে আপনা আপনি উপস্থিত হইয়া দুঃখময় সংসারকে "সুখের সংসারে" পরিণত করিবে।

স্বপ্ন দর্শন।

আমি যৌবনকালে এক সময় জগন্নাথ দেব দর্শনার্থ পুরীতে গিয়াছিলাম। প্রথমতঃ ষ্টেসন হইতে অবতরণ করিয়াই সমুদ্র দেখিয়া আমার মনে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। দেখিলাম, উত্তাল তরঙ্গায়িত কুল-কিনারা শূন্য অসীম জলরাশি ধুঁ ধুঁ করিতেছে, অপর পারের আকাশখানি সমুদ্র ভেদ করিয়া যেন উপরে সংলগ্ন হইয়াছে। এ পারে বিস্তীর্ণ স্থলভাগের বালুকা-রাশিতে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এই সমুদয় আশ্চর্য্য ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া অন্তঃ-করণে সেই অসীম অনন্তের ছায়া পতিত হইয়া আমার পূর্ব্বস্মৃতি সমুদয় নষ্ট করিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আমার সঙ্গীর সহিত মন্দির সমীপে উপস্থিত হইয়া শিবসাগর নামক বিস্তীর্ণ জলাশয়ে

স্নানাহ্নিক ক্রিয়া সমাপনান্তে ক্ষুধার যন্ত্রণা নিবারণের জন্য আনন্দবাজার নামক অন্নক্ষেত্রে যাইয়া দেখিলাম, সেখানেও অতিশয় অদ্ভুত ব্যাপার। জাতিভেদের নাম-গন্ধ মাত্র নাই; অস্পৃশ্য হীন জাতীয়েরা অন্ন ব্যঞ্জনাদির দোকান পাতিয়া ভাল ভাল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের নিকট তাহা বিক্রয় করিতেছে। তাঁহারা তাহা সন্তুষ্টচিত্তে অকুণ্ঠিতভাবে ক্রয় করিয়া লইয়া আহার করিতেছেন। ঐ দৃষ্টান্তে আমরাও কিছু ক্রয় করিয়া লইয়া বাসায় যাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিলাম। পরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে জগন্নাথ দর্শনার্থ মন্দিরে গমনপূর্ব্বক অতি কষ্টে সেই ভগবানের কাষ্ঠময় মূর্ত্তি দর্শন, স্পর্শন ও প্রণামাদি করিয়া, বিগ্রহসেবকদিগের প্রাপ্য দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক সেখান হইতে প্রত্যাগমন করতঃ দুই দিনের মধ্যে বাটী উপস্থিত হইলাম। পরে প্রতিবাসিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এই সমুদয় বৃত্তান্তের পরিচয় প্রদান করিতে করিতে আমার কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। তাঁহারাও শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এইবার ইনি শেষ তীর্থ জগন্নাথ দেব দর্শন করিয়া ভক্তিলাভপূর্ব্বক মুক্তির পথে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু পাঠক, এ দেবতা দর্শন করিয়া আমার ভক্তি হওয়া দূরের কথা বরং আরও ভক্তি ছুটিয়া গেল। ভাবিতে লাগিলাম, লক্ষ লক্ষ তীর্থ দর্শকের ভক্তি হইতেছে, আমার হইল না কেন? সুতরাং আমি নিশ্চয়ই পাষণ্ড হৃদয়।

যাহা হউক, পুনরায় আর একবার জগন্নাথ দেব দর্শন করিতে হইবে, এইরূপ একটা ভাব আমার স্মৃতিপথে বদ্ধমূল হইয়া রহিল। এবং পুরাণাদি পাঠ করিয়া হিন্দু দেবতাদিগের সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহা আমার স্মরণ হইতে

লাগিল। আমার মনে পড়িল, হিন্দুদিগের পৌরাণিক ও প্রচলিত দেবদেবীদিগের দুইটী ভাব আছে। একটী রূপকযুক্ত বাহ্য আবরণমূলক স্থূলভাব, আর একটী নিরাকার মানসগত ব্যাপার-মূলক আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মভাব। যেমন দুর্গোৎসবের প্রতিমা। উহার বাহ্য আবরণমূলক স্থূলভাব হইতেছে, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সমুদয় দেবদেবীগণের একত্রে পূজা; যথা, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদি দেবতাদিগের স্তবস্তুতিপূর্ণ ধ্যানাদিযুক্ত প্রতিমা পূজা। আর আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম ভাব হইতেছে, পরম দেবতা পরমেশ্বরের লীলাভূমি এই কর্ম্মক্ষেত্রে মানবের সংসারধর্ম্ম পালন করিবার জন্য যত প্রকার শক্তি ও সম্পদের প্রয়োজন, তাহা প্রথমে পৃথক পৃথকরূপে আরাধনা ও প্রার্থনাপূর্ব্বক সাধন দ্বারা শক্তি ও সম্পদ সঞ্চয় করা। যথা, সংসারীর প্রথম ও প্রধান আবশ্যক হইতেছে আত্মজ্ঞান, পরমার্থ জ্ঞান ও বিবিধ বিজ্ঞানমূলক কর্ম্মজ্ঞান লাভ করা। সেই জন্যই অনন্ত জ্ঞানরূপিণী মহাশক্তি দুর্গাদেবী সর্ব্বপ্রধানারূপে আবির্ভূতা ও আরাধ্যা। দুর্গা শব্দে (দুর্গ+আ) যিনি দুর্গতি নাশ করেন। কিন্তু মানবের অজ্ঞানতার ফলেই দুর্গতি উপস্থিত হইয়া থাকে; উহা একমাত্র জ্ঞানবল ভিন্ন নাশ করিবার আর কোন উপায় নাই; সেই জন্যই প্রথমে জ্ঞানময়ী শক্তির সাধন আবশ্যক। আবার জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে গেলে কিছু অর্থসম্পদ সঞ্চয় থাকা চাই। ক্ষুধার যন্ত্রণায় পুত্রকন্যা কাঁদিয়া উঠিলে সমুদয় জ্ঞান-বিজ্ঞান হারাইয়া যায়। এই জন্যই শাস্ত্রে বলে, "দারিদ্র্যদোষ গুণরাশি-নাশী" "অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।"

মহাজ্ঞানী কালিদাস পণ্ডিত ক্ষুধার জ্বালায় এক সময় চৌর্য্যবৃত্তি

অবলম্বন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। তজ্জন্য দেবীর বাম পার্শ্বে ঐশ্বর্য্য সম্পদের আধাররূপিণী লক্ষ্মী দেবীর আবির্ভাব। অর্থকরী বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা ধনসম্পদ সঞ্চয়পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে। এক্ষণে দুর্গার দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মানা সরস্বতী দেবীর কথা। ইনি বিদ্যারূপিণী শক্তি, জ্ঞানলাভ করিতে হইলে বিবিধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থের সাহায্য লইতে হয়, জ্ঞানীদিগের উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু অনুশীলনীয় ভাষায় সাহিত্য বোধ না থাকিলে উহা কখনই গ্রহণ করা যায় না। এইজন্যই জ্ঞান সাধনের সহায়তাকারিণী, বিদ্যারূপিণী সরস্বতী দেবীর আরাধনাপূর্ব্বক বিদ্যালাভ করা আবশ্যক। অনেকে বলেন, উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি ও ঈশ্বরে ভক্তি থাকিলে মানুষ, মানুষ হইতে পারে। কিন্তু তাহা হয় না। বিদ্যাহীন ব্যক্তি পরম যোগী, অতিশয় জ্ঞানী, সুশ্রী ও বিশিষ্ট ধনী হইলেও ভ্রম কুসংস্কারের আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন হইয়া দ্বিপদ পশুর ন্যায় থাকিয়া যায়। বিদ্যা-রূপিণী দেবী স্ত্রীমূর্ত্তিধারিণী ; তাহাতে অনুমান করা হয়, প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন।

তৎপরে কার্ত্তিক দেবতা। ইনি শ্রী সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। সংসারীর সর্ব্ব বিষয়ে সুশৃঙ্খলাভাবে সৌন্দর্য্য রক্ষা করা আবশ্যক। ঈশ্বর স্বয়ং সৌন্দর্য্যপ্রিয়; তাঁহার প্রকাশময় জগৎ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় সুতরাং তাঁহার আদেশ পালন করিতে হইলে সকল বিষয়ের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে হইবে। এক্ষণে কার্ত্তিক দেবতার অপর পার্শ্বে অবস্থিত গণেশের কথা। ইনি গজানন অর্থাৎ ইঁহার মুখমণ্ডলসহ মস্তকটী ঠিক হস্তীর আকার বিশিষ্ট।

পশুজগতে হস্তীর ন্যায় বলবান অথচ ধীর প্রকৃতির জীব

দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং গণেশের এই মূর্ত্তিতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইলে হস্তীর ন্যায় বলশালী ও ধীর প্রকৃতি হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। মস্তিষ্ক হইতে উত্থিত বিবেচনা শক্তির দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন ও ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংযম করতঃ শারীরিক বল সঞ্চয় করিতে হইবে। সেই জন্যই মস্তকটি হস্তীর মস্তক করা হইয়াছে।

মানব যতই বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানী বা পণ্ডিত হউক, শারীরিক বল না থাকিলে তাহা দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। সে সামান্য প্রতিকূল বিষয় বা বিপক্ষ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। সতত প্রাণভয়ে তাহাকে সঙ্কুচিত ও সন্দিগ্ধ থাকিতে হয়। যথা :—কোন সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা দুর্ব্বল ব্যক্তিরাই অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া থাকে। আরোহীপূর্ণ নৌকা জলমগ্ন হইলে দুর্ব্বল ব্যক্তিরাই প্রাণ হারাইয়া ফেলে। আর বলবান ব্যক্তিরা সন্তরণপূর্ব্বক তীরে উত্থিত হইয়া প্রাণরক্ষা করে। অতি সামান্য আঘাতেই দুর্ব্বল ব্যক্তি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সামান্য শীতাতপ সহ্য করিতে না পারিয়া কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। হীনবল ব্যক্তি দ্বারা রক্ষিত প্রভূত ধন সম্পত্তি দস্যু তস্করেরা বলপূর্ব্বক লইয়া হাসিতে হাসিতে পলায়ন করে।

এই সমুদয় কারণে মানবের শত শত কর্ত্তব্য সম্মুখে উপস্থিত হইলেও তাহা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে শরীর রক্ষা ও তাহাতে বল সঞ্চয়ের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই জন্যই প্রাচীন মনিষীগণ সকল দেবতার অগ্রে গণেশের পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এক্ষণে দেবীর শস্ত্রাঘাতে নিহত মহিষাসুরের কথা বলা যাইতেছে। পশুজাতির মধ্যে মহিষ নামক প্রাণী অতিশয় ক্রোধপরায়ণ।

ইহারা সামান্য কোন কারণে ক্রোধান্বিত হইয়া গেলে, একটা কিছু না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। সেই জন্যই মানবের বিবেক বিধ্বংসী ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তিরূপে উহাকে স্থাপিত করা হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে মানবের ঐ ক্রোধরূপ আসুরিক প্রবৃত্তিকে "রিপু" অর্থাৎ শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তজ্জন্যই উহার নাম রাখা হইয়াছে "মহিষাসুর।" মনুষ্যের কোন প্রকার ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রতিহত হইয়া ধৈর্য্য নষ্ট হইলে তাহাতে ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং উহাকে একেবারে, অস্বাভাবিক শত্রু বলিতে পারা যায় না। উহা অনেক সময় আমাদের দুর্ব্বল চিত্তকে সবল করিয়া দিয়া আত্মরক্ষার সহায়তা করে এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মে একাগ্রতা ও অধ্যবসায় আনয়ন করিয়া দিয়া বন্ধুর ন্যায় উপকার করে। কিন্তু এই সমুদয় গুণ থাকিলেও ক্রোধকে বিবেকের অধীনে সংযত করিয়া না রাখিতে পারিলে অনেক সময় বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া বিপন্ন করিয়া থাকে। এই জন্যই শাস্ত্রে বলে ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয়। পরন্তু একমাত্র জ্ঞানবল ভিন্ন ইহাকে সংযত করিয়া ক্ষমা অবলম্বন করিবার আর কোন উপায় নাই। সেই জন্যই জ্ঞানরূপিণী মহাশক্তি দুর্গাদেবী বিবেকরূপ শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক পরম শত্রু ক্রোধরূপ মহিষাসুরকে বধ করিতেছেন। এক্ষণে দেবীর সম্মুখে ছাগবলির কথা।

পশুজগতে ছাগজাতি অতিশয় কামান্ধ জীব। জগদীশ্বর বোধ হয় যেন উহাদিগকে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্যান্য পশুদিগের সন্তানোৎপাদনের একটা স্বাভাবিক সময় নির্দ্দিষ্ট আছে; তাহারা ঠিক সেই নিয়মের

বশবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থপূর্ব্বক সন্তানোৎপাদন করে। কিন্তু ইহাদের তাহা নাই। ইহারা প্রায় সর্ব্বদাই ভ্রাতা, ভগ্নী, মাতাপিতা নির্ব্বিশেষে ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যায় রত থাকিয়া তিন মাস অন্তর সন্তান প্রসব করে। সুতরাং এরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীব পশুদিগের মধ্যে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখিতে পাওয়া যায় কেবল, অধিকাংশ মানুষের মধ্যে। এ সম্বন্ধে সেই প্রকার মানবগুলিকে পশু অপেক্ষাও অধম বলা যায়। সুতরাং মানবের মধ্যে যাহারা অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কামান্ধ, তাহারা ঠিক ছাগ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। ঐ দুর্জ্জয় রিপুকে বিবেকবল ভিন্ন দমন করিবার আর কোনও উপায় নাই। সেই জন্যই জ্ঞানরূপিণী শক্তির সমক্ষে ঐ ছাগপ্রকৃতিকে বিবেকরূপ খড়্গ দ্বারা বলিদানের ব্যবস্থা। এক্ষণে দুর্গাদেবীর মস্তকোপরি চিত্রপটে অঙ্কিত তাঁহার স্বামী শিব ও অন্যান্য দেবতাগণের কথা। শিব শব্দে মঙ্গল। সেই মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা তাঁহার সহধর্ম্মিণী জ্ঞানময়ী মহাশক্তিকে পরিচালিত করিয়া তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া লইতেছেন এবং অন্যান্য দেবতাগণ তাঁহার সহায়তা করিতেছেন।

সুতরাং ঐ জ্ঞানরূপিণী শক্তির প্রভাব মঙ্গলময় চিত্ররূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই জন্যই দেবীর মস্তকোপরি মঙ্গলময় শিবকে চিত্রপটে স্থাপন করা হইয়াছে। এক্ষণে দেবীর পদতলে স্থিত তাঁহার বাহন সিংহের কথা। পশুর মধ্যে সিংহ অতিশয় বল বিক্রমশালী ভয়ঙ্কর জীব। যদিও হস্তীর প্রভৃত শারীরিক বল আছে, কিন্তু সিংহের ন্যায় বিক্রম নাই। এই জন্যই সিংহ পশুর রাজা। এক্ষণে এই জ্ঞানরূপিণী দুর্গাদেবীকে

সিংহপৃষ্ঠে আরোহিতা দেখিয়া আমরা এই আধ্যাত্মিক উপদেশ পাইতেছি যে, "তিনি কেবল জ্ঞানরূপিণী নহেন, অর্থাৎ ইহা তাঁহার পূর্ণ স্বরূপ নহে ; তাঁহার মূলে অতুল প্রভাবান্বিতা, অসাধ্য সাধনকারিণী ভয়ঙ্করী মহাশক্তি রহিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে কটাক্ষে এই বিশ্ব লয় করিতে পারেন। আজ যেখানে বিস্তীর্ণ জলরাশি প্রবলবেগে তরঙ্গায়িত হইতেছে, কাল হয়ত সেখানে প্রকাণ্ড আগ্নেয় পর্ব্বত মস্তকোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা ইতিহাস ভূগোলে ও ভূবিদ্যায় ভূরি ভূরি পাইয়া থাকি। আকাশমণ্ডলস্থিত অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী প্রবলবেগে শূন্যপথে নিয়মিতরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে ; এই সমুদয় সেই অনন্ত মহিমাময়ের মহিয়সী শক্তির বলে নিষ্পন্ন হইতেছে ; সুতরাং ইহার নিকট সিংহের শক্তি অতি তুচ্ছ। ইহা কেবল দৃষ্টান্ত মাত্র। ইহা দেখিয়া আমরা এই উপদেশ পাইতেছি যে, কেবলমাত্র জ্ঞানময়ীর সাধন করিলে সংসারীর চলিবে না, কারণ জ্ঞানের নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। মনে কর, তোমার জ্ঞান নির্ব্বাচন করিয়া দিল জলকষ্ট দূর করিবার জন্য কোন স্থানে জলাশয় প্রস্তুত করিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে জলাশয় হইল না। সুতরাং এই জন্য তদুপযোগী ধনবল, জনবল ও বিবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির একত্রে সমাবেশ থাকা চাই। কেবলমাত্র এক ব্যক্তির শারীরিক বলেও উহা সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব সংসারী গৃহস্থের আত্মরক্ষা ও কর্ত্তব্য সম্পাদন জন্য জ্ঞানোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেবীর পদতলস্থিত সিংহের আদর্শে সকল প্রকার শক্তি সঞ্চয়পূর্ব্বক প্রভাবান্বিত ও বলবিক্রমশালী হইতে হইবে। ইহাই

হইল, দুর্গোৎসবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এইরূপ হিন্দু দেবদেবীর পূজা ও পৌরাণিক বৃত্তান্তের অনেক আধ্যাত্মিক রহস্য আছে; তাহা বর্ণনা করিবার স্থান এ গ্রন্থে নাই। এক্ষণে সেই জগন্নাথ দেবের কথা স্মরণ করা যাউক। তাঁহার সেই কাষ্ঠময় অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি দর্শনে আমাতে যে অশ্রদ্ধার ভাব সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা এই আধ্যাত্মিক তরঙ্গ উত্থিত হইয়া লুপ্ত হইতে লাগিল। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, সমুদয় তীর্থের শেষ তীর্থ যখন এই জগন্নাথ, তখন নিশ্চয়ই ইহাতে কিছু আধ্যাত্মিক রহস্য আছে। বস্তুসমূহের উৎকৃষ্টত্ব ও নিকৃষ্টত্ব লইয়া আমরা আলোচনা ও বিচার করি বটে, কিন্তু সেই সর্ব্বত্র সমদর্শী জগন্নাথের নিকট তাঁহার স্বরূপগত বিষয়সমূহ সকল অবস্থায় উৎকৃষ্ট। তথাপি সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রে উৎকৃষ্ট বস্তুর তুলনা দ্বারা তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। গীতাকার বলিয়াছেন, যাহা কিছু প্রভাবান্বিত, ঐশ্বর্য্যশালী ও সৌন্দর্য্যময়, তাহাতে 'আমি' আছি। কিন্তু যাহাতে ঐ সমুদয় গুণ নাই, তাহাতে কে আছেন তাহা আর বলিয়া যান নাই।

এরূপ হইবারও যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহার ভাবময় রাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রেমসাগরে ডুবিতে হইলে, প্রথমতঃ উৎকৃষ্টের দিক হইতে অগ্রসর হইলে সত্বর ভক্তির উদয় হয়। পরে ভক্তি দৃঢ় হইয়া গেলে তখন আর উৎকৃষ্টে নিকৃষ্টে ভেদ জ্ঞান থাকে না। সেই জন্যই বোধ হয় জগৎকর্ত্তা জগন্নাথ অন্যান্য তীর্থে উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শেষ তীর্থ জগন্নাথ ক্ষেত্রে এইরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা এই উপদেশ পাইতেছি যে, উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, সুন্দর, কদাকার সকলের মধ্যেই

তিনি সমানভাবে রহিয়াছেন। সুতরাং অপকৃষ্টও তাঁহার স্বরূপ বলিয়া তাহাকেও ভক্তির চক্ষে দেখিতে হইবে।

সেই জন্যই এখন কলিকাতার রাস্তাপার্শ্বে ভিক্ষুকরূপে উপবিষ্ট স্খলিতাঙ্গুলিবিশিষ্ট কদাকারদিগকে দেখিলে আমার জগন্নাথের কথা মনে পড়ে। তিনি যেন এই মূর্ত্তিতে ভিক্ষার্থী হইয়া আমাদের উপচিকীর্ষা বৃত্তি চরিতার্থ করতঃ আমাদিগকে প্রেমশিক্ষা দিতেছেন এবং এই জন্যই ধনী মহাত্মাগণ কুষ্ঠাশ্রম প্রস্তত করিয়া জগন্নাথ দেবের প্রকৃত পূজা করিতেছেন। আরও একটী আশ্চর্য্য শিক্ষাপ্রদ আধ্যাত্মিক ব্যাপার আমার মনে উদিত হইল, তাহা সেই আনন্দবাজার নামক অন্নক্ষেত্র। শেষ তীর্থের ইহা সাম্যবাদের দৃষ্টান্ত, ইহাই বোধ হয় শিক্ষিত ও উন্নতিশীল মানবের শেষ পরিণতি। মানুষ, মানুষকে যে বিড়াল কুকুর অপেক্ষাও ঘৃণা বোধ করিয়া অস্পৃশ্য ও হেয় করিয়া রাখিয়াছে, ইহা কেবল পৃথিবীর মধ্যে আমাদের দেশে হিন্দুসমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বল্লাল সেনের আমল হইতে হিন্দু নেতাগণ বংশগত জাতিভেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিঞ্জর প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে থাকিয়াই স্বীয় স্বীয় জাতিগত ব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক পরস্পর সহানুভূতি শূন্য হইয়া সম্মিলিত জাতীয় শক্তিকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া অতি কষ্টে জীবন যাপন করিতেছেন। ইহাতে সমগ্র হিন্দুজাতির যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বর্ণনা করিবার স্থান এ গ্রন্থে নাই। স্থূলতঃ ইহা হিন্দুজাতির আত্মরক্ষা ও উন্নতির পথের কণ্টক স্বরূপ হইয়াছে।

এই সমুদয় বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়া স্বপ্নযোগে যাহা দেখিলাম, তাহাই এখন পাঠককে বলিব।

পৈত্রিক দেহটা হারাইব কি? ইহা শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, এখানে দেহ হারাইবেন না; এই সেই অমৃতের সাগর, এখানে ডুবিলে মানুষ অমর হয়। যেখানে যাইবার জন্য মানব জন্ম জন্ম কঠোর তপস্যা করে, ইহাই সেই মহাতীর্থ ঈশ্বরপুরী। ঐ দেখ, পরম চৈতন্যময় অদ্ভুত জ্যোতিবিশিষ্ট মহাসমুদ্র চিরস্থির অচল অটলভাবে বিরাজ করিতেছেন। উহা হইতে চিন্ময়ী আলোক রশ্মি ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া প্রেমময় প্রবাহযোগে ভাবময় তরঙ্গ উৎপাদনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা সেই অনন্ত মহিমাময়ের মহালীলা প্রদর্শন করিতেছেন। উদ্বেলিত তরঙ্গমালা হইতে আনন্দময় বীচি উৎপাদন করিয়া কেমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-রাশি বিকীর্ণ হইতেছে। ঐ ভাবময় তরঙ্গ হইতে যে সুমধুর শব্দ শুনিতে পাইতেছ, উহাই সেই অনন্তের বংশীধ্বনি।

এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ ঊর্দ্ধদিকে বায়স্কোপের ছায়া-চিত্রের ন্যায় একটী অতি সূক্ষ্ম আলোকবিন্দু অনুভূত হইতে লাগিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ বিন্দুটী ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত হইয়া একটী সৌম্যমূর্ত্তি ধ্যান-নিমীলিতনেত্র মানবদেহরূপে আমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল। ইহাতে আমি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া পুনরায় বিবেকধারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা আবার কি দেখিতেছি? তিনি বলিলেন, এই সেই জগন্নাথ দেবের মন্দির। আমি বলিলাম, ইহা যে একটী মানব দেহ। মন্দির ত দেখিতেছি না। তাহাতে তিনি বলিতে লাগিলেন, ভাই! তুমি পূর্ব্বে যে মনুষ্যনির্ম্মিত মন্দির দেখিয়াছিলে, উহা প্রকৃত মন্দির নহে; ঐ মানবদেহই জগন্নাথের যথার্থ মন্দির। তিনি আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য আপনার স্বরূপের অভিব্যক্তি অর্থাৎ জ্ঞান, প্রেম,

আনন্দ, পবিত্রতা, ন্যায়পরতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি অশেষ গুণরাশি লইয়া ঐ দেহরূপমন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে আত্মারূপে অণু প্রবিষ্ট হইয়া মানবলীলা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ঐ যে নিমীলিত নেত্র দেখিতেছ, মানব মাতৃগর্ভে ঐরূপ চক্ষু মুদ্রিত করতঃ অবনত মস্তকে ঈশ্বর ধ্যানে নিমগ্ন থাকে; ভূমিষ্ঠ হইলে ঐ ধ্যানযোগ ভঙ্গ হইয়া দুঃখে ক্রন্দন করিতে থাকে। ক্রমে দেহমন্দিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি গঠিত হইয়া পূর্ণতা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ইত্যাদি সূক্ষ্ম দেহের বিকাশ হইয়া থাকে। তখন ঐ অহঙ্কারমূলক আমিত্বটী বাহ্যজগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও নানাবিধ ইন্দ্রিয় সুখ-সম্ভোগে মোহিত হইয়া সুনির্ম্মল আত্মাকে স্বকৃত মলিন স্বভাব দ্বারা আবৃত করে। পরে সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে অনুতপ্ত হইয়া যদি তাহার ব্যক্তিগত অহঙ্কারমূলক আমিত্বটী পুনরায় আত্মাভিমুখীন হয়, তখন সে ঈশ্বরানুগত্য লাভ করিয়া সমুদয় ভয় ও দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পায়। তখন জগন্নাথ তাহাতে আত্মপ্রকাশ করতঃ তাঁহার সেই আনন্দময় শান্তি-নিকেতনে আশ্রয় দান করেন। অতএব জগন্নাথ দর্শনার্থ আর বহু পথ অতিক্রম করিতে হইবে না। এই দেহ মন্দিরের মধ্যেই তিনি স্বপ্রকাশ পরম জ্যোতির্ম্ময়রূপে নিত্য বিরাজিত আছেন। আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনাযোগে একান্তমনে অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে এই দেহমধ্যে পাওয়া যাইবে। বিবেকধারী এই কথা বলিতে বলিতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল এবং গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সম্পূর্ণ।